nwic` Kvcwj I Zvi Awe¯‹Z avb‡bi RvZ

‡de“qvix 10, 2008, ˆ`wbK bqv w`Mš—

হরিপদ কাপালিকে নিয়ে আর কিছু কি বলার আছে? কারণ অনেক কথাই বলা হয়ে গেছে ইতোমধ্যে। এবং এখনও বলা হচ্ছে বেশ। এদের মধ্যে পুরোধায় আছেন দু-এক জন প্রভাবশালী মিডিয়া মোগল। হয়তোবা তাদেরই প্রভাবে কাপালি কোনো কোনো কবির কবিতায় এসেছেন। এসেছেন কোনো কোনো বিজ্ঞানীর লোক-প্রবন্ধের খোরাকি হয়েও। কাপালি ভাগ্যবান। রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত পাননি বটে; তবে স্বীকৃতি পেয়েছেন অনেক প্রতিষ্ঠানের। ঝিনেদার দূর এক গ্রামের এই বেচারি কৃষক এখন সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা বাঙালিদের থেকেও কল্কে পাচ্ছেন বলে মনে হয়। তার বাকি ইতিহাসটা এখন কেমন হবে কে জানে! কাপালি কী তার আবিষ্কার দিয়ে ম্যাগসাইসাই-এর নজর কাড়তে পারবেন? অথবা বিশ্বখাদ্য পুরস্কার! যা কৃষি বিজ্ঞানের নবেল বলে ধরা হয়। নাকি যারা তাকে কাঠখড় পুড়িয়ে পাদপ্রদীপের আলোয় টেনে তুলছেন তারাই বাকিটা ভাগিয়ে নেবেন।

আসলে কাপালি করেছেনটা কী? তাঁকে নতুন ধানের জনক বলে ডাকা হচ্ছে। ছেলেপুলে হীন কোনো এক সাধারণ কৃষকের কাছে স্বপ্নের অতীত ছিল এই বিশেষণ। তাঁর নিজের কোনো সন্তানাদি নেই বটে। পালিত পুত্রের হাতঘুরে যে ধানের ছড়াটি তাঁর হাতে এসেছিল কে জানতো যে সেটাই হবে এক জাদুর ছোঁয়া। কাপালিকে দেখে নির্বিকার এবং নিরহংকারী মনে হয। তবে অনেক অহংকারীদের থেকেও তিনি অনেক বুদ্ধিমান। তিনি অনুসন্ধিৎসু একজন বিজ্ঞানীর মতই ছড়াটির সদ্ব্যবহার করেছেন। তার সৌভাগ্যটা যেখান থেকে শুরু: ছড়াটিতে মেন্ডেলের তত্ত্ব অনুযায়ী আনুপাতিক হারে কোনোপ্রকার প্রজন্মগত পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া দেখা যায়নি। যদি তাই হতো, তবে জাত নির্বাচনের শুরুতেই তিনি বেশ কিছু জগা-খিচুড়ি জাতের দেখা পেতেন। এবং দিক-ভ্রান্ত হয়ে এই কাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারতেন। কিন্তু তা হয় নি। বলা যায় তিনি যা পেয়েছিলেন তা একটি সুস্থির প্রজন্মের সারি। হতে পারে। কারণ তিনি জাতটি পেয়েছিলেন বি আর ১১'র জমিতে। গবেষণাগারে কোনো জাত উদ্ভাবনের মূহুর্তে শুধূ একটি জাত নিয়েই নাড়া-চাড়া করা হয় না। সেখানে নানা জাত নিয়ে নানামুখী পরীক্ষার খাতিরে একাধিক কৌলিক সারি (এদের মধ্যে অনেকগুলোই কৌলিতাত্ত্বিক দিক দিয়ে একই পিতৃ-মাতৃ সারি থেকে আগত ভগ্নী-সারি হতে পারে) নিয়ে কাজ করা হয়। এভাবেই সরেজমিনে পরীক্ষা কার্যক্রমের সময়, অলক্ষ্যে অনাকাঙ্খিত জাতের দুএকটা বীজ মিশে যেতে পারে। এই মিশ্রণের হার বিঘায় একটি হলেও কালে কালে তা অনেক হতে পারে। শ্রীযুত কাপালির সংগৃহীত বি আর ১১'র বীজে হয়তো এমনি একটি বীজ ছিল। যা থেকে একটি গাছ হতে পেরেছিল। কাপালি বাবুর পালিত পুত্রের নজর তীক্ষ্মই বলতে হয়। পরিচর্যার কোনো এক পর্যায়ে ঠিকই আলাদা করে চেনা একটি ধানের ছড়া দিয়ে পিতৃদায়ের প্রথম পর্ব শেষ করেছেন আরকি। এই গাছ কাপালির হাতে ভালো ফলন দেয়। প্রথমে পড়শী, তারপর এগাঁও-সেগাঁও করে প্রথমে ঝিনেদা তারপর ঢাকাতক কাপালির সুনাম পৌঁছে যায়। মিডিয়াতে এই ধান হরিধান বলে প্রচার পায়। কাপালিরও সময়োচিত দাবি ছিল অন্তত পঞ্চভুতে মিশে যাওয়ার আগে এই ধান জাত হিসাবে যেন স্বিকৃতি পায়।

কাপালির আশা কি পূরণ হওয়ার মতো? জাতে উঠতে হলেতো অনেক চড়াই-উৎরাই পেরুতে হয়। কাপালি কী তা পেরেছেন? মিডিয়া এক কথা, আর সত্যিকারের গবেষণাগার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের যথাযথ অনুমোদন আরেক কথা। ধান এমনি এক গুরুত্বপূর্ণ ফসল যে তাকে নিয়ে মনের মাধুরী মিশেয়ে কিছু করবার অধিকার সবার ভাগ্যে জোটে না। তাই তো শুধূমাত্র ধান গবেষণাকে কেন্দ্র করে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে; যা **International Rice Research Institute (IRRI)** নামে পরিচিত। সাথে পৃথিবীর প্রায় সবগুলো ভাত-খাওয়া দেশে ধান গবেষণাকে ঘিরে নতুন করে কর্মযোগ্য শুরু হয়। কারণ বিজ্ঞানীদের জানা ছিল, IRRI উদ্ভাবিত IR8 জাত যতই ফলনশালী হউকনা কেন সে যুগের চাহিদা মেটাতে পারবে না। তাই দেশে দেশে তার পরিবেশ ও সংস্কৃতি অনুসারে আলাদা আলাদা ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। এমনি একটা প্রতিষ্ঠান **Bangladesh Rice Research Institute (BRRI)**। নিজস্ব গবেষণার পাশাপাশি IRRI তার নিজের উদ্ভাবিত কৌলিক সারি, প্রায়োগিক কৌশল, মানব-সম্পদের উন্নয়ন ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় দেশীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করে থাকে। তবে এই যে দেয়া-নেয়া তা আন্তর্জাতিক নিয়ম মেনেই চলে। যেমন তাদের সংকরায়িত একটি কৌলিক সারি IR532-1-176 আমাদের দেশে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বি আর ১ নামে অনুমোদন পায়। তারপর সময়ের প্রেক্ষাপটে বিজ্ঞানীদের বানাতে হয় বি আর ২, বি আর ৩ করে, ব্রিধান ২৮, ২৯ বা ৪০, ৪১। এ পর্যন্ত অনুমোদিত জাতের সংখ্যা অর্ধশতের কাছাকাছি। এখন যে জাতগুলো আসছে সেগুলোকে আর উচ্চ ফলনশীল বলে বিশেষায়িত করবার দরকার নেই। আধুনিক জাত বলে আখ্যায়িত করা হয়। কারণ ফলন বেশি দিলেই যে জাতটি ভালো বলে মেনে নেওয়ার যুগ বেশ আগেই শেষ। এখন বিজ্ঞানীরা মনে করেন, অঞ্চল ভেদে জাতের ফলনসুস্থিরতা কেমন, জাতটি বৈরী পরিবেশে কতখানি টিকে থাকতে পারে, কত রকমারী বালাই প্রতিরোধী হতে পারে, প্রাপ্ত ফলন আর্থনীতিক ভাবে ফলপ্রসু কিনা, ভাত কেমন, পুষ্টিমান কী, মুড়িচিড়া হয় কি না, পরিবেশ বান্ধব কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি। বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নিয়ে বছরের পর বছর, দফায় দফায় পদ্ধতিগত এবং চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয়। সব গুণ যে একটি জাতের মধ্যে আসবে এমন কোনো কথা নয়। তবে সমস্যা ভিত্তিক কিছু গুণের সমাহার তো হতেই হয়। তারপর সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠান কাঙ্খিত কৌলিক সারিটি জাত (বীজ) হিসাবে অনুমোদনের জন্য "বীজ অনুমোদন কর্তৃপক্ষকে" জানান। বীজ অনুমোদন কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে এবং আলাদাভাবে যাচিত বীজের বিভিন্ন গুণাগুণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। তারা যদি গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাবীকরা গুণাগুণের ব্যাপারে খুশী হতে পারেন তবেই তা জাত হিসাবে অনুমোদন পায়। তাও আজকাল চান্দিনা, বিপ্লব এই জাতীয় কোনো নাম নয়; ব্রিধান ২৭, ২৮ এই নামে নামকরণ করা হয়। কারণ কিছু স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান যেমন আনবিক কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, কৃষি সম্পর্কিত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক অধ্যাপকবৃন্দ গবেষণা করে বেশ ভালো জাত তৈরি করেছেন। সেগুলো উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠানের নামে নামকরণ করা হয়। যেমন: বিনা-৬, বাউ-৬৩। তবে ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসাবে BRRI 'র নামই আগে আসে। তাই কাপালিবাবুর উদ্ভাবিত জাতকে জাত হিসাবে অনুমোদনের প্রথম পদক্ষেপ হলো ব্রি-র বিজ্ঞানীদেরকে এই সারি (এখন থেকে সারি বলাই শ্রেয়) নিয়ে নানামুখি গবেষণা করতে দেওয়া। তারপর তাঁরা সন্তুষ্ট হলে জাত হিসাবে অনুমোদনের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের হাতে সঁপে দেওয়া। কাপালি বাবু এগুলো জানেন কিনা জানিনা। তবে তাঁকে নিয়ে যারা মিডিয়া

মাতাচ্ছেন তারা বোধ হয় কিছুটা জানেন। তাই ব্রি'র হাতে এই ধানের কিছু নমুনা এসেছিল। ব্রিতে পরীক্ষা করা হয়েছে। কাপালি বাবুর নিজের জমিতে ব্রি-র বিজ্ঞানীদের তত্ত্বাবধনে শুধুমাত্র ফলন কতখানি দিতে পারে তা নিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু ব্রি-র বিজ্ঞানীদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির বাধা কাপালির এই কৌলিক সারিটি পেরুতে পারেনি। মিডিয়াতে সংশি-ষ্ট বিজ্ঞানীদের সাক্ষাতকার এসেছিল। কিন্তু মহাভারতের সেই অশ্বত্থামা হত ইতি গজ'র মত। কৌরবের পক্ষে যুদ্ধকৌশল রচনারত অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যকে তাঁর পুত্র অশ্বত্থামার মিথ্যে মৃত্যুর সংবাদ দিয়ে মানষিক ভাবে দুর্বল করে দেওয়ার দরকার হয়। কে করবে এই কাজটা। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির! তিনি মিথ্যা বলতে পারেন না। এ কথা সবার মত দ্রোণাচার্যেরও জানা। যুধিষ্ঠির জানেন অশ্বত্থামা নামে একটি হাতি (গজ) মারা গেছে। তাই কারও কূটকৌশলে যুধিষ্ঠিরকে পাঠানো হলো সর্বজন শ্রদ্ধেয় দ্রোণাচার্যেরও কাছে, অশ্বত্থামার মৃত্যুর খবর জানানোর জন্য। এমন আর কি কঠিন কাজ? যুধিষ্ঠিরের খবর পরিবেশনের শেষ পর্যায়ে লুকিয়ে রাখা ডঙ্কা-নিনাদ করা হয়। ফলে দ্রোণাচার্য *গজ* কথাটা শুনতে পানি। তিনি নিজের ছেলে অশ্বত্থামা মারা গেছে বলে ধরে নেন। তাঁর এই মানষিক ভাবে ভেঙে পড়া পাণ্ডবদের জয়ে অনেকখানি সহায়ক হয়েছিল বলে মনে করা হয়। কুরুক্ষেত্রের এই ধর্মযুদ্ধে যতই *ধর্মসংস্থাপনার্থায়* বলা হোক না কেন, যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে দ্রোণাচার্যকে যে ভাবে প্রতারিত করা হয় তা কি আদৌ আইন সিদ্ধ? একই অভিযোগের তীর ছোঁড়া যেতে পারে কিছু কিছু মিডিয়া ব্যাক্তিত্বদের দিকে। যারা জাত উদ্ভাবনের প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন না করেই হরিপদ কাপালিকে নিয়ে বড় বেশি মাতামাতি করেছেন। এখনতো সবাই Intellectual property right এর পথে পা বাড়িয়ে। তাহলে কাপালি বাবু যে জাতটি আবিষ্কার করলেন বলে জাহির করছেন তাকি সত্যি তার নিজের আবিষ্কার? নাকি অন্যের আবিষ্কার নিজের বলে চালানো। এ যেমন একজনের খোয়ানো টাকা আরেক জনে পেয়ে নিজের বলে দাবি করা। কিন্তু তা করা যায় না । এখানে যা কর্তব্য তা হলো, ঐ টাকাটা পেয়েই ব্যংকে গিয়ে জমা দেওয়া। কাপালি বাবু কিন্তু তা করেননি। কাপালি বাবুর কৌলিক সারিটি সহ উষ্ণ-মণ্ডলীয় সমস্ত আধুনিক জাতের বংশধারায় IR8 এর ধারা মিশে আছে। BRRI তো IRRI 'র অনুমতি সাপেক্ষে IR8 এর ধারা আমাদের দেশিধারায় মিলাতে সক্ষম হয়েছে। তাই কাপালি বাবুর সারিটি যে ব্রি'র নয় তাই বা কে বলবে। কাপালি বাবু যথাযথ কর্তৃপক্ষের (BRRI কিংবা IRRI) কাছ থেকে কোনো অনুমতি গ্রহণ করেননি। এমনওতো দিন আসতে পারে যে প্রকৃত আবিষ্কারক বা আবিষ্কারকেরা তাঁদের বুদ্ধিস্বত্ত্ব দাবি করে বসতে পারে । তিনি তো তখন ফেঁসেও যেতে পারেন। তবে ব্রি হয়তো তা করবে না। কারণ কাপালি বাবুর কৌলিক সারিটি জ্ঞান বিচারে আহামরি কিছু নয়। এর চেয়েও ভালো ভালো কৌলিক সারি ব্রি-র জার্মপ-াজমে আছে। সেগুলোই যখন জাতে উঠতে পারলো না সেখানে মিডিয়া খ্যাত হরি ধান নিয়ে চিন্তা করার সময় কোথায়? তবে এ থেকে স্থানীয় চাষীরা সাময়িক কিছু ফায়দা পেলে আপাত কারও কোনো ক্ষতির কারণ নেই। কারণ জানা আছে, এ থেকে টেকসই ভালো কোনো সমাধান নেই। এ ব্যাপারে মাঠ পর্যায়ের কৃষি কর্মকর্তাগণ বিশেষ ভুমিকা রাখতে পারেন।

Lvevi wb‡q Akwb ms‡KZ Ges Avgiv

AvMó 7, 2008, ˜wbK msev˜

ক'বছর ধরে খাবার নিয়ে তেমন কোনো টানাপোড়েন ছিল না। ধান আমাদের প্রধান খাবার যোগায়। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং আধুনিক আবাদ-কলা-কৌশলের হাড্ডা-হাড্ডি লড়াইয়ে ধানের অবস্থান ছিল নজরকাড়া। তাই ভাতের অভাব হতে পারে এমনটি সাধারণের ভাবনায় আসেনি। তবে ধান-বিজ্ঞানীদের একটা আগাম হিসেবে কষা ছিল। ২০২৫ সাল নাগাদ দেশের লোকসংখ্যা হবে ১৮.৪ মিলিয়ন; চাষের জমি নীট ৮.৩ মিলিয়ন হেক্টর থেকে কমে দাঁড়াবে ৭.৮৯ মিলিয়ন হেক্টরে। তাহলে ধানের ফলন কত হারে বাড়াতে হবে, কীভাবে বাড়াতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের যে গবেষণার প্রকৃতি তা দিয়ে হয়তো এই চাহিদা মেটানো সম্ভব। সম্ভব বলছি এই কারণে যে, আবিস্কৃত ধানের ফলন আশ্যাপ্রদ। এখন ধানের জীবনকাল কমে আসছে। আমরা নোনায় টিকে থাকার মত যুতসই ফলনের জাত বের করতে পেরেছি।   নাবি বানের ধকল কাটাতে নাবি আমনের জাতও আমাদের আছে। সাম্প্রতিক কালের জাতগুলো বেশিকরে বালাই, এবং পীড়ন প্রতিরোধী করে বানানো হচ্ছে। গবেষণা এবং চাষী পর্যায়ের ফলনের লক্ষ্যযোগ্য পার্থক্য কমিয়ে আনার জোর প্রক্রিয়া চলছে। আমরা আশাবাদি যে, অদূর ভবিষ্যতে আমাদের ধান শীতে কাতর হওয়ার সুযোগ পাবে কম। আমনে চুবানি খেলেও পরিস্থিতি বুঝে সামলে নিতে পারবে। পানির খরচ কমে যাবে ঢের। বোরোতে উচ্চফলনশীল সুগন্ধি এবং সর– রফতানিযোগ্য জাতও অবমুক্তির দ্বারগোড়ায়। আমরা জোয়ারভাটা এলাকার উপযুক্ত জাতও বের করতে পেরেছি। সুপার রাইচ প্রযুক্তি আমাদের মুঠোর মধ্যে। (তবে যে দেয় বেশি তার খোরাকও বেশি। তাই সুপার রাইচের অতিরিক্ত খোরাক পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে এই আশংকায় এই গবেষণা আপাতত শিকেয় তুলা আছে।) তবে সব হিসেবেরই ব্যতয় ঘটে যায়। বিশেষত দীর্ঘকালীন কোনো পরিকল্পনার ক্ষেত্রে দৈব-দুর্বিপাককে এদ্দিন খুব একটা আমলে আনা হয় নাই। কারণ এই দুর্বিপাক, কখন হবে, কেমন হবে, কদ্দিন পর পর হবে তা এখনও সঠিক করে বলার সময় হয় নাই। তবে যখনই হোক তা যে মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনে তা আমাদের সাম্প্রতিক সিডর থেকে ধারনা করা যেতে পারে। এবারে যে চরম খাদ্য ঘাটতির সম্ভাবনা তার অন্যতম কারণ এই সিডর। ১৯৪২-এ এমন এক প্রলয়ংকরী ঘূর্ণীঝড়ের কথা জানা যায়। এর পরই আসে ১৯৪৩-এর মন্বন্ড়র। কেউ কেই বলে থাকেন বাদামি দাগ রোগে সারা বাংলার ধান ফসল নষ্ট হয়ে যায়। যার অনিবার্য কারণ ছিল আকাল। অবশ্য অমর্ত্য সেন দুর্ভিক্ষকে দেখেছেন ভিন্ন আঙ্গিকে। তিনি যুক্তিতর্ক দিয়ে দেখিয়েছেন, তখন বাংলায় চালের অভাব ছিল না। অভাব যা ছিল তা সাধারণ মানুয়ের ক্রয়ক্ষমতার সামর্থ। ইস্টার্ন রণাঙ্গনে জাপানি সেনাদের কাছে বৃটিশ সেনারা মার খেয়ে পিছু হঠছে । ভয়, জাপানিরা কখন বাংলা দখল করে বসে। ত্রস্ড় বৃটিশ সেনারা শ্রীলঙ্কা ও মধ্যপ্রাচ্যেও বিভিন্ন জায়গায়। বৃটিশ সরকার তার সৈন্যদের রসদ সরবরাহ নিশ্চিত রাখতে মধ্যপ্রাচ্য এবং শ্রীলঙ্কায় বাংলার চাল রফতানি করতে থাকে। চালের দাম বাড়তে থাকে হু হু করে। ফলে চালের কারবারের সাথে জড়িত বড় আকারের চাষি, মজুতদার ও ব্যবসায়ীরা ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকে রাতারাতি। পক্ষান্ড়রে সাধারণ চাষী, মুটে-মুজুর-সাধারণ মানুষদের আয় কমে যায় আশঙ্কাজনক হারে। ফলে তারা ক্রয় ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। বিভূতিভূষণের অশনি সংকেতে এই অবস্থার মহাকাব্যিক বর্ণনা আছে। সত্যজিত এই অশনি সংকেতকে চলচিত্রায়িত করেছিলেন। তবে এসব বর্ণনায় সরকারের ভুমিকা কী ছিল তা বুঝা যায় না। অন্নদাশঙ্করের বর্ণনায় দুর্ভিক্ষ-কালীন এক

জেলা থেকে আরেক জেলায় চাল সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করার কথা জানা যায়। তিনি রাতের বেলায় গরুর গাড়িতে করে চাল পাচারের কথা বলেছেন। বৃটিশ সরকার এব্যাপারে উদাসীন ছিল বলে জানা যায়। দুর্ভিক্ষ প্রশমনের কোনো চেষ্টাও তারা তেমন করেনি। তখনকার ভারতবর্ষের সেক্রেটারি অব স্টেটের পক্ষ থেকে জরুরী খাদ্য সরবরাহের অনুরোধ করে ইংল্যান্ডে টেলিগ্রাম করা হয়। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী চার্চিল তখন নির্বোধ এক রসিকতা করে টেলিগ্রামের জবাব দিয়েছিলেন, "খাবারের যদি এতই সংকট তবে গান্ধী এখনও মরেনি কেন"? কৃষণ চন্দর কোলকাতার অনাহার এবং অনাচারের পাশাপাশি অবস্থানের বাস্তব চিত্র এঁকেছেন তাঁর অন্নদাতা উপন্যাসে। তাই বলা যায় অমর্ত্য সেনই ঠিক। তবে যে ঝড় হলো, রোগে খেলো তার প্রভাবটা কোথায় গেল? নাকি অমর্ত্য সেনের আরও কিছু দুর্ভিক্ষের পদাবলী আমাদের এখনও শুনতে বাকী আছে। তো যাই হোক না কেন একটা ব্যাপারে সবাই একমত হবেন যে বাংলায় দুর্ভিক্ষ মানেই ভাতের অভাব। অর্থাৎ চালের ভূমিকা সেখানে মুখ্য। সিডর হলো ২০০৭-এ। ভরা ফসলের প্রজনন পর্যায়ে এই ধাক্কা ক্ষতিগ্রস্থ এলাকাকে লক্ষীছাড়া করে দেয়। দেশ-বিদেশ থেকে তাঁবু আসে, অষুধ-পত্র আসে, বিশুদ্ধ পানি আসে, আর আসে কাপড়-চোপড় নগদ সাহায্য। খাবার যতটা দরকার ততটা আসেনি বলা যায়। নিরন্ন মানুষের হাতে টাকা দিয়ে কী হবে? বাজারে চাল নেই। বিশ্ব বাজারেও চালের সরবরাহ কম। কারণ যারা চালের প্রধান যোগানদার তাদের উৎপাদন আশানুরূপ না। সেই ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড এমনকি ভারতও আমাদের কাছে চাল বেচতে ইতস্ততঃ করছে। অর্থাৎ টাকা থাকতেও চাল পাওয়া যাচ্ছে না। আর এই অবস্থা যদি চলতে থাকে তবে দুর্ভিক্ষতো অনিবার্য। তাই শুধু খাদ্যক্রয়ের সামর্থ নয়, খাদ্য উৎপাদনও বাড়াতে হবে এবং তা নিজের ঘরেই।

অমর্ত্য সেন আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন; যথাযথ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দুর্ভিক্ষের জায়গা নেই। আমাদের এখন একটা অন্তর্বর্তী কালীন ব্যবস্থা চলছে। সবারই আশা একটা সুস্থ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আমরা অবশ্যই পাবো। তবে ভোটের মাপে না হলেও মনের মাপে চলতি ব্যবস্থায় জনগণের সায় ছিল বলা যায়। তাই দুর্ভিক্ষের অশনি-সংকেত এ সরকার বুঝতে পারছে না এটা বলা যায় না। সিডরের পরবর্তী কৃষি পুনর্বাসনে সরকারের করিৎকর্মা ভূমিকা ছিল। সবচেয়ে সরকারের বেশি নজর চালের উৎপাদনের দিকে। আপাতত ঘাটতি মেটানোর বা খাদ্যের ভারসাম্য রক্ষার জন্য সরকারের চাল-কূটনীতিও তুলনাবিহীন। দেশে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সরকারের পদক্ষেপ লক্ষ্যনীয়। সরকার চালের ঘাটতির অনেকটাই বোরোর মাধ্যমে মেটাতে চেয়েছিলেন। এজন্য বোরোর জন্য নতুন এলাকা বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে। বেশি করে হাইব্রিড ধানের আবাদের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাথে সার বিদ্যুৎ ডিজেল ইত্যাদি সরবরাহের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। অতিরিক্ত সতর্কতা হিসাবে প্রত্যেক জেলায় একজন করে অভিজ্ঞ ধান বিজ্ঞানীকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে যেন প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার হয়। এসবই করা হয়েছে ফলনের ঘাটতি পুষিয়ে নেওয়ার তাগিদে। এবং সেটা সম্ভব হয়েছে বলা যায়।

এরপরও কিছু কথা বলার আছে। যেমন- ঠিক বীজটা ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় দেওয়া গেছে কী? সাধারণ হিসাবে হেক্টরে এক টন ফলন বাড়াতে পারলেই ঘাটতি মিটে যাবে আর এই একটন বাড়ানোর সহজ যে ফর্মূলা অনুসরণ করা হচ্ছে তা

হলো হাইবিড। হাইব্রিড অপেক্ষাকৃত কম সময়ে বেশি ফলন দেয়। এটাই স্বাভাবিক। তবে হাইব্রিডের এই বাড়তি ফলনের জন্য প্রাথমিক শর্তগুলো হলো-

১. হাইব্রিডের জন্য অনুকূল পরিবেশ চাই
২. হাইব্রিড চাষীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল হতে হবে
৩. হাইব্রিড চাষীকে যথেষ্ট প্রশিক্ষিত হতে হবে

সিডর পরবর্তী ধানের ফলন বাড়ানোর লক্ষ্যে যাদের হাতে হাইব্রিডের বীজ তুলে দেওয়া হয়েছে, তারা কি আদৌ এই প্রযুক্তি লালনের জন্য এখনই উপযুক্ত? তাছাড়া যে জাত কোনো এলাকা বিশেষে চাষীদের হাতে দেওয়া হলো সেটা ঐ পরিবেশের জন্য আদৌ উপযুক্ত কিনা? আমরা জানি জানুয়ারির শেষ সপ্তাহ্ থেকে বোরো লাগালে ফলন কমতে থাকে। চারার বয়স বেশি হয়ে গেলেও ফলন কমে যায়। আমদানিকৃত হাইব্রিডের বেলায় অনেকে সাফাই গাইতে পারেন। তাদের নিজেদের প্ক্ষ থেকে উপস্থাপিত কিছু উপাত্তও এই সাক্ষী দিতে পারে। তবে তাদের পরীক্ষিত উপাত্ত কোনো হাইব্রিডের কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় অভিযোজন উপযোগিতা যাচাইয়ের জন্য যথেষ্ট নয়। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট তার জাত উদ্ভাবনের বিভিন্ন পর্যায়ে যে সমস্ড় পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে থাকে এই সমস্ড় হাইব্রিডের বেলায় অবশ্যই তা করা হয় না। শুধু মাত্র ফলন কতখানি দিল এবং কদিন আগে কাটা পড়ল সেটাই দেখার বিষয় না। অধিকাংশ হাইব্রিডের দেশীয় পরিবেশে শারীরবৃত্তীয়, মৃত্তিকা বা প্রতিবেশগত অভিযোজন ক্ষমতা (বালাই ও পীড়ণ) ইত্যাদির কোনো উপাত্ত আমাদের হাতে নেই। তাই এগুলো যদি কোনো বালাই বা পরিবেশ পীড়নের শিকার হয় তখন দায়ী হবে কে? এমন হতে পারে, কোনো কোনো রোগ জীবাণু বা পোকামাকড় এখনও পর্যন্ড় গৌন হয়ে আছে। কিন্তু অযাচিত বা কম পরীক্ষিত কোনো জাতের প্ররোচনায় কোনো কোনো গৌন বালাই মুখ্য হয়ে দেখা দিতে পারে। সত্যিকথা বলতে এবারের বোরোতে হাইব্রিড ধানের বেলায় এই অবস্থার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে। সার দেশের হাইব্রিড ধান এবার cvZvi jvj‡P †iLv রোগে আক্রান্ড় হয়। রক্ষে যে এবার তার প্রভাব ফলনে তেমন দেখা যায়নি। এই রোগটা আমাদের দেশে এখন পর্যন্ড় গৌন। তবে অধিকাংশ হাইব্রিড যেখান থেকে আসে সেই চিনে কিন্তু এই রোগটি মুখ্য। অতএব সাধু সাবধান ! হাইব্রিড ধানের চাষ আপতত নিয়ন্ত্রণে আনা দরকার যদ্দিন না এই রোগ প্রতিরোধী কোনো হাইব্রিড চাষীদের হাতে না দেওয়া যায়।

অর্থনীতিবিদরা বলছেন একমাত্র ফলন বাড়িয়েই দুর্ভিক্ষের অশনি থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। তারা বলছেন, ইনপুটগুলো যেন নিশ্চিত করা যায়। নীতিনির্ধারকগণও অনেক কথা বলেই খালাশ। অথচ মাঠের মানুষগুলো গলদঘর্ম। সার সংকটের কথা শোনা যায়। ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট শুধু সার ব্যবস্থাপনা না, আনুষঙ্গিক অনেক কিছুর উপরই গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। সময়মত সঠিক বয়সের চারা লাগিয়ে, সার সহ সঠিক পরিচর্যা করে হেক্টরে সহজেই কৃষকের স্বাভাবিক ফলনের চেয়ে হেক্টরে ২-৩ টন ফলন বেশি পাওয়া যায়। এটা ধান গবেষণা ইনসিটিটিউটের মাঠ পর্যায়ে ফলন পার্থক্য কমিয়ে আনার বহু কার্যক্রমে কৃষককে দিয়েই তা প্রমাণ করা হয়েছে।

ধানের রাজনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। আমরা চালের দাম কম চাই। অথচ উৎপাদনের জন্য যা প্রয়োজন তা আমরা যথা মূল্যে ধান চাষীদের যোগান দিতে পারি না। অথচ ধান রাজনৈতিক ফসল। প্রধানতম এই ফসল শুধু দুর্ভিক্ষের অশনি সংকেতই দেয় না রাজনৈতিক অস্থিরতারও ইঙ্গিত দেয়। ধানের সত্যি কোনো বিকল্প নেই। ধান আমদানি করতে চাইলেও যখন পাওয়া যায় না্ বিষয়টি তখন ভেবে দেখবার মত। অর্থাৎ আমাদের চাহিদা আমাদেরকেই মিটাতে হবে। আমাদের সীমিত জমিতেই তা করতে হবে। এজন্য এখন থেকে সরকারকে ধান নিয়ে আলাদাভাবে কিছু করা দরকার। এবং মাঠের সাথে সম্পৃক্ত ধান বিজ্ঞানী ও সম্প্রসারণবিদদের নিয়েই তা করতে হবে।

AvKv‡ji K_v, AKv‡ji K_v

AvMó 14, 2008, ˆ˜wbK msev˜

”আকাল” কথাটির সাথে আমাদের আজন্ম পরিচয় হয়ে যায় এমনি এমনি। কারণ ঝরা কিংবা খরার দেখা পেলেই মুরব্বিদের বলতে শুনেছি, দেশে আবার আকাল পড়ে কিনা! আকাল পড়লে চালের দাম বেড়ে যায়। বাজার অস্বাভাবিক হয়ে উঠে। খেয়ে না খেয়ে থাকতে হয়। চুরি-ডাকাতি বেড়ে যায়। ছিনতাই-ডাকাতি হয়। ভিটে মাটি থেকে নির্বাসিত হয় অনেকে। শহরের রাস্ড়ায় কঙ্কালসার মানুষের ভিড় বাড়ে। অনাহার অপুষ্টিতে মারাও যায় অনেকে। আবার ফাঁকতালে কিছু মানুষ যেমন জোতদার-আড়তদাররা বড়লোক হওয়ার সহজ পথটা খুঁজে নেয় একই সময়। মুরব্বিদের কারো কারো জীবনের কোনো একসময়ের এমন অভিজ্ঞতার অনেকেই গিলিত চর্বন করে। এভাবেই কিছুটা ভয় আর কিছুটা সন্দেহের মধ্য দিয়ে বছরে আসে, বছর যায়। আকাল হয়তো আসতে আসতেও আসে না। ঘরে ফসল আসলে সবার মধ্যে কিছুটা স্বস্ড়ি দেখা যায়। আর না এলে অস্বস্ড়ি। আমাদেরতো প্রধান অবলম্বন কোনোক্রমে বেঁচেবর্তে থাকার কৃষি। তাই এইযে স্বস্ড়ি আর অস্বস্ড়ি, এর মাঝে বিভেদ টানা কঠিন। কারণ বেশির ভাগ মানুষই প্রায় ভুমিহীন, প্রান্ড়িক বা বর্গা চাষি। একসময় অল্পকিছু ধনী চাষি পরিবার ছাড়া বেশির ভাগ মানুষেরই আষাঢ় কিংবা কার্তিকের কোনো কোনো সময় কাজ এবং ভাতের জন্য ছুটোছুটি করতে হয়েছে। এ যেন গা-সওয়া ছিল। অর্থাৎ অভাবের সাথেই আমাদের বেশির ভাগ মানুষের ঘর-বসতি। এটাই যেন নিয়তি। এই অভাবকে সাথে করেই বেড়ে উঠা, জীবন নির্বাহ, বিয়েসাদি এবং সন্ড়ান উৎপাদন। সবকিছুকে ব্যালেন্স করতে গিয়ে তাদের কম খেতে হয়। তারা অপুষ্টিতে ভোগে। বাসস্থান এবং প্রয়োজনীয় অনেক কিছুকে তারা আমলে নেয় না। তবে এই অভাবকে আকাল বলা যাবে না অবশ্যই। কারণ অভাব নিত্য-নৈমিত্তক কোনো ঘটনা। আর আকাল? সে যেন সময় নিয়ে বিভিষীকা আকারে দেখা দেয়। আর তাই অভাবের অভিজ্ঞতা যখন-তখন হলেও আকালের সাথে পরিচয় হয় বেশ কিছুদিন বা যুগ পরপর।

দক্ষিণ এশিয়া জনসংখ্যার ভারে নুব্জ। কৃষি উৎপাদনে আমুল পরিবর্তন আসলেও সবখানে দুর্বল অর্থনীতির ছাপ স্পষ্ট। নাকি দুর্বল অর্থনীতির কারণেই কৃষি গবেষণার সুফল এখনও "সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে" (সাসটেইনেবল) পর্যায়ে আছে। প্রতিবেশও মাঝেমধ্যে বৈরী হয়ে উঠে। তাই ভয়ে ভয়ে থাকতে হয় কখন যেন আকালের শিকার হতে হয়। তবে একথাও ঠিক কৃষি নির্ভর আমাদের এই অর্থনীতি কিছুটা হলেও আকালকে বেশ কায়দা করে ঠেকিয়ে রেখেছে বলে মনে হয়। তাই আমাদের এই অঞ্চল আকাল-প্রবণ হলেও অনেককাল ধরে আকালের দেখা নেই। তবে অতীতে বেশ কিছু আকালের ঘটনা ঘটেছে। বি এম ভাটিয়ার (১৯৮৫) Famines in India গ্রন্থে এগার থেকে সতর শতকের মধ্যে ১৪ টি আকালের কথা বলা হয়েছে। সাত শতকেও আকালের কথা জানা যায়। আমাদের বাংলাদেশে প্রথম যে আকালের রেকর্ড পাওয়া যায় তাহলো ১৭৭০ সালে। কমবেশি এক কোটি লোকমারা যাওয়ার কথা বলা হয়েছে ঐ সময়ে। দ্বিতীয় আকালের যে ঘটনা তা খুব বেশি আগের না। ১৯৪৩ এ। প্রায় ৩০ লাখ লোকের জীবন যায়। এর মাঝে ১৭৮৩, ১৮৬৬, ১৮৭৩-৭৪, ১৮৯২, এবং ১৮৯৭ সালে আকাল পড়েছে বলে জানা যায়। অনেক আকালের হয়তোবা কোনো যুতসই রেকর্ড নেই। আমাদের স্বাধীনতা পরবর্তী কয়েক বছরে অজন্মা এবং আকালের যুগলবন্দী দেখা গেছে। প্রধানত '৭৪-এর কথা মনে করতেই হয়। তখন অনাহারক্লিষ্ট হারাধনদের অগস্ত্যযাত্রার ছবি, প্রায় বস্ত্রবিহীন বাসন্তীদের ছবি পত্রিকায় এসেছে। তবে কেন যেন আকালের মত করে কোন রেকর্ড বইয়ে তা জায়গা করে নিতে পারেনি। এমন হতে পারে তখনকার বিশ্বরাজনৈতিক পরিমণ্ডলে আমাদের আকাল-পরিস্থিতি তেমন একটা গুরুত্ব পায়নি। আকালেরও আবার প্রকারভেদ আছে কিনা। ১৮৮০ সালে Indian famine code তৈরি করা হয়। সেই নীরিখে খাদ্যাভাবকে আকাল হিসেবে বিবেচনা করার আগে আরও দুটো পর্যায় বিবেচনায় আনার কথা বলা হযেছে। প্রথম পর্যায় খাদ্যের cvq Afve (near scarcity) এবং দ্বিতীয় পর্যায় খাদ্যের Afve (scarcity)। ১৯৮০ এবং ৯০ এর দশকে দুর্ভিক্ষ প্রশমনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো আকালের প্রকটতা নিরূপনের জন্য জীবনযাত্রা ও পুষ্টি, এই দুটো মাত্রা যোগ করে দেয়। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি এবং USAID, ২০০৪ সালের দিকে মৃত্যুহার, শিশুপুষ্টি, জীবনযাত্রা ইত্যাদি সমন্বয়ে আকালের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে এক নতুন ধারার প্রচলন করে। মৃত্যুহার বিবেচনায় অভাবের তাড়নায় হাজার খানেক লোকের প্রাণহানি ঘটলে তা minor famine এর পর্যায়ে পড়ে। আর এই হার ১০ লাখের মতে হলে major famine বলে ধরা হয়। এই পার্থক্যটা কতটা যুক্তিযুক্ত তা বিশেষজ্ঞরাই বলতে পারবেন। সম্ভবত এই মেজর আর মাইনরের ফাঁদে পড়ে আমাদের '৭৪ এর আকাল এখনও তেমন আন্তর্জাতিক আলোচনায় আসে না। তা না আসুক; এই আলোচনা বহির্ভূত আকালই কেমন ভয়াবহ হতে পারে তা আমাদের প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়েছে।

সভ্যতার শুরু থেকেই হয়তোবা সমাজ এবং আকালের সহ অবস্থান ছিল। সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ বেদে সরাসরি আকাল বা দুর্ভিক্ষ বলে কিছু আছে বলে জানা নেই। তবে জল দাও, ফল দাও, ধন দাও, গাভী দাও, মান দাও বলে দেবতাদেরকে খুশী করার যথেষ্ট প্রশস্তির কথা আমরা জানি। এই চাহিদাগুলো যে শুধু সাধারণ অভাববোধ থেকেই আসে বলে বিশ্বাস করা কষ্ট। আকালের অন্যতম কারণ জনসংখ্যার চাপ হয়তো তখন ছিল না। কিন্তু আকালের আরও যেসব কারণ আজকের অর্থনীতিবিদরা বের করেছেন সেগুলোর দু-একটা নিশ্চয়ই ছিল। আরও ভাবনার বিষয় যে, যারা বেদ রচনা করেছেন

(আর্যরা) তারা কেন মধ্য এশিয়া থেকে ভারতবর্ষে আসলেন। আকালই এর কারণ হতে পারে। তাদের নিজেদের জায়গায় যদি কোনো গোষ্ঠি বিদ্রোহ হয়ে থাকে তা হয়তো এই আকাল সংক্রান্তই। মিশরের ফারাওদের যে পরিণতি আমরা দেখি তা নিশ্চয়ই মরুভূমির প্রসার বা নীল নদের ছোবল থেকে তৈরি। এগুলোরও প্রতিফল যে আকাল হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ঐশীগ্রন্থ তোরাহ্'য় দুর্ভিক্ষের প্রতীকী উপস্থাপনা আছে। আর পৃথিবীর সব শাস্ত্রে যে মহাপ্লাবনের কথা আছে, তাতো শুধুই পাপমোচনের জন্য ছিল না। এই মহাপ্লাবণের পরও যারা বেঁচে ছিলেন তাদেরকে অবশ্যই দু-একটা আকাল পাড়ি দিতে হয়েছে।

আকালের কারণ নিয়ে অর্থনিতীবিদদের অনেক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আছে। আকাল হতে পারে বৈরী প্রকৃতির কারণে। যেমন খরা। ভারতবর্ষে আকালের অন্যতম কারণ হিসাবে খরাকে প্রতিপক্ষ করা হয়। আকাল হতে পারে মানুষের তৈরি। মানুষের তৈরি আকালের বেলায় কোনো স্বার্থান্বেষি শাসকচক্র সরাসরি ভূমিকা রাখতে পারে। কখনও বা দুর্বল প্রশাসনিক ব্যবস্থাও দায়ী। কখনও যুদ্ধ বিগ্রহ। পৃথিবীর তাবদ আকালের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় কোন আকালই একক কারণে ঘটে না। প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, জীবতাত্ত্বিক নানা কারণের সমন্বয় ঘটে থাকে এর পেছনে। তবে দেশ-কাল-পাত্র ভেদে এই কারণগুলোর কোনোটির ভূমিকা কম কোনোটির ভূমিকা বেশি হতে পারে।

পণ্ডিতরা যত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণই করুন না কেন সাধারণ মানুষ কিন্তু জানে খাবারের তীব্র অভাবই আকাল। এই খাবারের প্রধানতম উৎস হলো কৃষি। এজন্যই গতানুগতিক কৃষিকে উৎপাদনশীল করার তাগিদে গত শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে শুরু হয়েছিল এক মহাকর্মযজ্ঞ। যাকে সবুজ বিপ্লব বলে আখ্যায়িত করা হয়। আপাত খাদ্যচাহিদা মেটানোই যেন ছিল এই বিপ্লবের পরম উদ্দেশ্য। কিন্তু কৃষি মানেই যে কিছুটা জীববৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতির কারণ তা বোধ হয় কারো মাথায় আসেনি। সবুজ বিপ্লবের কারণে নাইট্রোজেন-পছন্দ ফসলের আবাদ বেড়েছ। গত শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত কিছুটা হলেও এর ফল পাওয়া গেছে। ফসলের ফলন বেড়েছে ২৫০ শতাংশ। যে কারণেই আকাল আসুক না কেন তার প্রভাব কিছুটা হলেও কমানো গেছে। মানুষের তাৎক্ষণিক খাবার চাহিদা মিটেছে। পুষ্টি সমস্যার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। সেই সাথে সামাজিক তথা রাজনৈতিক অস্থিরতা দমনেও ভূমিকা রেখেছে বলে মনে করা যায়। এই সমস্ত কারণেও সবুজ বিপ্লবের জনক বলে পরিচিত ড. নরমান বোরলগকে ১৯৭০ এ নবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। যদিও তাঁর নবেল-সাইটেশনে বলা হয়েছিল ভরপেট মানেই শান্তি। আর তা অর্জিত হয়েছে বরলোগের নেতৃত্বে। কিন্তু চুপিসারে আমাদের অনেক ক্ষতিও হয়ে গেছে। সবুজ বিপ্লবের কারণে পরিবেশ-বান্ধব গতানুগতিক আবাদ-পদ্ধতি ব্যহত হয়েছে। নাইট্রোজেন এবং বালাই নাশকের ব্যবহার বেড়েছে প্রয়োজনের চেয়েও বেশি। আবাদের জন্য সংবেদনশীল প্রান্তিক জমিকে আবাদের আওতায় আনতে হয়েছে। মাত্রারিক্ত ব্যবহারের কারণে মাটির স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে। ফলে বিগত শতকের শেষ ভাগে গিয়ে সবুজ বিপ্লব ফিকে হয়ে যায়। ফল কি দাঁড়িয়েছে এখন আমরা বেশ বুঝতে পারছি। এক সময় সার-পানি ও উচ্চ ফলনশীল বীজের মণিকাঞ্চন যোগ হলেই আশাতীত ফলন পাওয়া গেছে। তারপর বালাই নাশকের ব্যবহার শুরু হয়। উচ্চফলনশীল বীজের সাথে এই ইনপুটগুলো যথেষ্ট পরিমাণ দিয়েও এখন আর আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায়

না। সার ব্যবহারের উপযোগিতা আগের মত নেই। ক্ষেতেবিশেষে কমে গেছে। উপকারী পোকার বাস্তুসংস্থান ধ্বংশ হয়ে গেছে। অপকারী পোকারা বেঁচে থাকার প্রয়োজনে তাদের মধ্যে বালাই প্রতিরোধী একাধিক উপজাত তৈরি করে নিয়েছে। তাই একই কীট নাশক দিলে আপাত একই জাতের পোকা সার্থক ভাবে দমন করা যায় না। রোগ বালাই এমনকি আগাছার বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। পানি ও মাটি দুষিত হয়ে গেছে। পানি ও মাটিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক, বিষাক্ত ভারি ধাতব পদার্থ এবং কীটনাশকের অবশেষ প্রভাব ক্রমান্বয়েই বেড়ে চলেছে। অতিরিক্ত পানি উত্তোলনের ফলে পানির স্ড়্র নেমে যাচ্ছে। এসবের অর্থ পরিশ্কার। আমরা এক আকাল থেকে বাঁচতে আরেক আকাল পরিস্থিতির দিকে ধাবিত হয়েছি।

কৃষিকে ভিত্তি করে বাঁচা আর বাঁচার জন্য নানারকম শিল্প-কারখানা গড়ে তুলা সবই স্বাভাবিক পরিবেশের জন্য কমবেশি হুমকির কারণ। এগুলোর একটা মাত্রা থাকা দরকার ছিল। মাত্রার বাইরে যাওয়ার কারণেই বাতাসে গ্রীণ হাউস গ্যাস বাড়ছে। সাথে বাড়ছে তাপমাত্রা। মের্র বরফ গলছে। হিমালয়ের হিমবাহ একই পরিস্থিতির শিকার। সাগরে পানির উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে। সাগর সমতল পৃথিবীর অনেক দেশ ডুবে যাবে বলে ধারনা। পাশ্চাত্যের কোনো কোনো সাংবাদিক এনিয়ে এক নির্মম রসিকতাও করেছেন। হিমালয়ের হিমবাহ শীতে ভারত, পাকিস্ড়্ন, আফগানিস্ড়্ন, বাংলাদেশ, নেপাল ভুটান, চিন, কম্বোডিয়া সহ বেশকিছু দেশের বিখ্যাত সব নদীগুলোকে সজীব রাখে। হিমবাহ যদি মরে যায় তাহলে গঙ্গা, ব্রক্ষপুত্র, ইয়াংজি, মেকং, ইযেলো নদীগুলোও মরে যাবে। ফলে শুষ্ক মৌসুমে প্রচ খরা আর বর্ষায় ভয়ানক প্লাবনে এই নদীগুলোর অববাহিকায় অবস্থিত সমস্ড় জনপদ বারবার ক্ষতিগ্রস্থ হতে থাকবে। প্রায় আড়াইশ' কোটি মানুষের বাস এই অববাহিকাসমূহে। বেশকিছু সভ্যতার পীঠস্থান এই নদীগুলো। খরা ও বন্যার উপর্যুপরি হানায় সৃষ্ট আকালে তাহলে কি এই সভ্যতাগুলো একদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে? থমাস ম্যালথাস বলেছিলেন প্রকৃতিপ্রদত্ত বৈরী কিছু কারণে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হয়। এবং খাদ্যচাহিদার সাথে ভারসাম্য ফিরে আসে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের এখনকার পদ্ধতি তার জানা থাকার কথা না। সবুজবিপ্লব হতে পারে এটাও হয়তো তাঁর ধারনায় আসেনি। তাঁর তত্ত্বের অনেক পর সবাই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য চেষ্টা করছে। ফলন বাড়াতে চেষ্টা করছে। তারপরও আমাদের মত দেশগুলোর গরীবের মেয়ের ছেঁড়া শাড়ির মতন অবস্থা যেন। একদিক ঢাকতে গিয়ে তো আরেকদিক বেআব্র। তাহলে কি ম্যালথাসই ঠিক! আকাল ঠেকাতে গিয়ে নিজেরাই একদিন আকালের শিকার হবো নাকি। এই আকাল যেন তেন আকাল নয়। একেবারে মানবীয় বিপর্যয়। এ থেকে রক্ষে করবারও কেউ থাকবে না।

নিশ্চয়ই এই পরিস্থিতি কেউ চায়না। তাই বিকল্প একটা ব্যবস্থা চাই। যেখানে প্রকৃতি খুব একটা বিরূপ হবে না। আর যদি হয়ও তাকে যেন সহজেই বাগে আনা যায়।

Avgb wb‡q wKQ K_v t wKQ Aš¦ivq
AvMó 23, 2008, ˆ`wbK msev`

আগস্টের মাঝামাঝি সব রোপা আমনের জমি লাগিয়ে ফেলার কথা। কিন্তু এবারের খবর ছিল; ঐ সময়েরও মধ্যে লক্ষ্য মাত্রার পূরণ হতে অনেক বাকী। অর্থাৎ ফলনের লক্ষ্য মাত্রায় না পৌঁছানোর সম্ভাবনা। গেল বারের আমন ফসল অনেকটাই মার খায় নাবি বন্যা এবং সিডরে। ক্ষতি পুষিয়ে নিতে বোরোর উপর জোর দিতে হয়। সরকার, কৃষক ও কৃষি বিশেষজ্ঞদের ত্রিমুখী চেষ্টায় বোরোর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা গেছে। এই অর্জনে ব্রি উদ্ভাবিত জাতসমূহেরই প্রধান ভূমিকা ছিল। তবে নীতিনির্ধারকদের মধ্যে খাদ্য ঘাটতি মিটাতে একেবারেই তাৎক্ষণিক প্রয়োজনটাকে বড় করে দেখা হয়েছে বলে মনে হয়। সরকার থেকে হাইব্রিডের উপর বেশ নজরদারি করা হয়েছে। বেসরকারি বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো বিদেশে উদ্ভাবিত হাইব্রিডের জোর প্রচারনা চালিয়েছে। এবারের অধিকাংশ হাইব্রিড ধান গাছ cvZvi jvj‡P †iLv রোগে আক্রান্ড় হয়। রক্ষে যে ফলনে তেমন প্রভাব পড়েনি। এর অর্থ এই নয় যে আমরা বেঁচে গেলাম। যে দেশে সারা বছর ধ'রে ধান চাষ করা হয় সে দেশে ধানের রোগ কম্পিউটার ভাইরাসের মত নিজের অজান্ড়েই নিজের সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে। এখনই সময় হাডুডু (রাজবাড়িতে ডুগ-ডুগ খেলা বলে) খেলার সেই শুরুর বুলিটা মনে করা: এ ডুগে (স্থানীয় ভাবে দম বন্ধ রাখার জন্য অর্থহীন উচ্চারণ) ধরা নাই, ফিরে ডুগে ছাড়া নাই। অতএব সাধু সাবধান। ধান বিজ্ঞানীরা অন্ড়ত তাই মনে করে। দেশের নামকরা কৃষিবিজ্ঞানী তথা শিক্ষাবিদ (আন্ড়র্জাতিক মানের বীজের রোগতত্ত্ব বিশারদও বটে) ড. গোলাম আলী ফকির তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত এক প্রবন্ধে এমনি আশংকার কথা বলেছেন। যাহোক বলছিলাম আমনের কথা । আমনের জন্য এখনও কোনো হাইব্রিড সুপারিশ কোনোপক্ষ থেকে আসেনি। কারণ এখন পর্যন্ড় উদ্ভাবিত হাইব্রিডের একান্ড়ভাবেই সেচ নির্ভর। কিন্তু আমন মওসুমে চাষ করতে হলে অবশ্য বৃষ্টি-নির্ভর হতে হবে।

বোরো মওসুমকে ধানের জন্য অপেক্ষাকৃত অনুকূল মওসুম বলে ধরা হয়। হাওড়ের কিছু নির্দিষ্ট জায়গা ছাড়া প্রায় পুরোটাই সেচ নির্ভর। ফসল প্রচুর দিনের আলো পায়। ধানের ফলনের জন্য প্রকৃতির দেওয়া এটাই কিন্তু প্রধান শর্ত। তারপরও কতখানি অনুকূল তা বিবেচনার দাবি রাখে। সামাজিক, অর্থনৈতিক কারণে চাষিরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সময়ের চাষ সময়ে করতে পারে না। হাওড়ের চাষিরা বন্যার নেমে যাওয়া পানির (Residual water) সদ্ব্যবহারের তাগিদে বোরো ধান কখনও কখনও আগাম লাগাতে বাধ্য হয়। এই বোরোর জনন পর্যায়ে (শিষের বিকাশ থেকে ফুল ফোটা) ঠান্ডায় আক্রান্ড় হওয়ার ভয় থাকে। এসব জায়গায়ই দেরি করে লাগালে পাকা ফসল বৈশাখি ঢলে (Flash flood) ডুবে যেতে পারে । উপরন্তু ঝড়-ঝঞ্ঝা-শিলাবৃষ্টির ভয়তো সব জায়গার জন্য সমান। আমন মওসুমের প্রকৃতিও বেশ জটিল। এই ফসল এখন পর্যন্ড় সম্পূর্ণ বৃষ্টি নির্ভর। আষাঢ় থেকে ভাদ্র পর্যন্ড় আমাদের দেশে প্রচুর বৃষ্টি হয়ে থাকে। কিন্তু এই বৃষ্টিপাত পুরো মওসুম ধরে সমানভাবে বিস্ড়ৃত না। কোনো কোনো বছর বৃষ্টি ভীষণ অনিয়মিত হয়ে যায়। ফলে লাগানোর সময় পানি পাওয়া যায় না। বা লাগানোর সময় পানি পাওয়া গেলতো শিষ বেরোনোর সময় পানি নেই। প্রতিষ্ঠার (establishment) পর গাছের Rbb chvq (Reproductive phase) সবচেয়ে সংবেদনশীল। এ সময় খরা ছাড়াও নাবি লাগানো আমন

ফসলকে (ধান) অঘ্রানি-ঠান্ডার মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়াও জলদি উঠে আসা বন্যায় বীজতলা বা লাগানো জমির চারা, প্রতিষ্ঠার সময়ে বা প্রতিষ্ঠার পরে ডুবে যেতে পারে। এমনও দেখা গেছে যে প্রথম বন্যায় ডুবে যাওয়ায় ফসলের ক্ষতি হয়ে গেল। এরপর পুনর্বাসন কর্মসূচিতে নতুন করে বীজতলা বানানো হলো, সময়ে চারাও লাগানো হলো এবং অকাল-পানি আসায় আবার ডুবে নষ্ট হয়ে গেল। গতবারের পরিস্থিতি এমনি ছিল। উপরন্তু পোকামাকড় ও রোগ বালাইও কম জ্বালায় না। অথচ আমন শব্দটা আরবি Avgvb শব্দের পরিবর্তিত রূপ। অর্থ নিরাপদ। অতএব আমন কথাটা দিয়ে যতই ˆbivc` বুঝানো হোক না কেন আসলে ততটা নিরাপদ না। সত্যিকথা হলো আমাদের কোনো মওসুমেরই গ্যারান্টি নেই যে একটা ভালো ফসল পাওয়া যাবে।

সাধারণভাবে আমন বলতে জলি আমন ধান বুঝায়, যেধান *বোশেখ-জষ্ঠি* মাসের বৃষ্টির পর জো' আসা শুকনো জমিতে বুনা হয়। আষাঢ়ে পানি আসার সাথে সাথে তা বাড়তে থাকে। একটা সীমা অবধি পানি বাড়ার সাথে সে পাল্টা দিয়ে বাড়ে। এই পানি-ভাঙা বা পানির সাথে পাল্টা দেওয়ার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে এই ধানকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। কিছু জাত যেমন বাগদার, ফুলকুঁড়ি, বাজাইল, জোয়াল ভাঙা, পঙ্খীরাজ, পরচুন, লক্ষ্মী দিঘা, হিজল দিঘা ইত্যাদি এক থেকে পোনে দুই মিটার পানি ভাঙতে পারে। অন্যদিকে লাকি, খামা, লাল আমন, ধলা আমন, গুটক, গৌরীকাজল ইত্যাদি দুই-আড়াই এমনকি তিন মিটার পর্যন্ত পানি ভাঙতে পারে। বন্যা মারত্মক আকার নিলে ধান হবে না। আর যদি না নেয় তবে কার্তিক বা অঘ্রানে সব জলি ধানে ফুল আসার কথা। পৌষে সেই ধান ঘরে আসে। তবে আশ্বিনা ধানে আশ্বিনে ফুল আসে এবং সবার আগে ঘরে তুলা যায়। আরেক জাতের আমন ধান হলো রোপা আমন। এটাকে শাইল ধানও বলে। কিছুটা উঁচু জমি যেখানে জল দাঁড়ায় সেখানে আবাদ করা হয়। আষাঢ়ে বীজ বুনে শ্রাবণে এই ধান লাগানো স্বাভাবিক নিয়ম। আমনের জাত-পাত যাই হোক না কেন ফুল ফোটার ব্যাপারে সবাই প্রায় এক কাতারে। এদের ফুল ফোটা দিনের দৈর্ঘের উপর নির্ভর করে। দিনের দৈর্ঘ যখন দশ ঘণ্টার কাছাকাছি নেমে আসে তখনই আমন ধান ফুল ফোটানোর জন্য তৈরি হয়। এটাকে তার দিবালোক-সংবেদনশীলতা বলে। জাতভেদে এই সংবেদনশীলতার হেরফের হতে পারে। ফুল ফোটার পর কমবেশি একমাস সময় নিয়ে ধান কাটার মত হয়। এই ধানের বেশির ভাগ পাকা ও কাটার কাজ হেমন্ত কালে সারা হয় বলে একসময় হৈমন্তিক ধান বলা হতো। যাহোক ধান মাড়াই-ঝাড়াই-শুকোনো ও গোলাজাত করতে করতে পৌষমাস। আধুনিক মাড়াই-যন্ত্রের বদৌলতে গেরস্তের মাড়াই করতে এখন দেরি হয় না। তাই পৌষ আসার আগেই আমনের কর্তনোত্তর কর্মকাণ্ড সেরে ফেলা হয়। তাছাড়া কোথায়ও রবি ফসল কোথায়ও আবার বোরো ধানের লাগানোর তাগিদ থাকে। যাহোক বাঙালির রক্তে মিশে থাকা ঐতিহ্য পৌষ-পার্বণ কিন্তু এখনও পৌষ মাসেই পালনের করা হয়। পয়লা বোশেখের মত সেকুলার উৎসব। সারাবাংলায় এই উৎসবের ব্যাপ্তী ও সরলতা দেখে মনে হয় একসময় আমনই ছিল প্রধান ধান। আমাদের পরিবেশের সাথে একেবারেই চলনসই এই ধানের উদ্ভব হয়েছে এখানেই। কিন্তু পরিবেশ-বান্ধব এই জলি আমন তার ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলেছে। আবাদ কমতে কমতে সারা দেশে মাত্র ৬০-৭০ হাজার হেক্টরে গিয়ে ঠেকেছে। সেচ-নির্ভর উচ্চ ফলনশীল বোরো ধানের আবাদ বৃদ্ধি এর অন্যতম কারণ। অর্থাৎ অনেক আমনের জমি বোরোয় রূপান্তরিত হযেছে। এছাড়াও উন্নয়নের নামে সারা দেশ জুড়ে অপরিকল্পিত, আধাকল্পিত রাস্ত

াঘাট, খাল-নালার অভাব নেই। এই কারণে বন্যার পানি আগের দিনের মত বাধাহীন ভাবে চলাচল করতে পারে না। তাই বর্ষায় কোথায়ও আটকা পানি হঠাৎ ছাড়া পেয়ে সহসা জলি আমনের জমি ভাসিয়ে দেয়। আকস্মিক এই পানি বাড়ার সাথে জলি আমন তার বেড়ে উঠার ফুরসত পায় না। কখনও বা পানি বাড়তে বাড়তে সহ্য ক্ষমতার চরম সীমা ছাড়িয়ে যায়। আবার কোথায়ও কখনও পানির অভাবে জলি আমন তার গা ভাসিয়ে হেলায় বেড়ে উঠার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ টুকু পায় না। এসমস্ত কারণেও চাষিরা জলি আমনের উপর থেকে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। রোপা আমনের কথা একটু আলাদা। বোরোর মতই রোপা আমনের আওতা বাড়ছে। এবং এই বাড়তিতে আধুনিক রোপা আমনের অবদানই প্রধান। তবে দেশি রোপা আমনের আবাদি এলাকাও এখন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য। প্রায় ২.১৭ মি. হেক্টর। পক্ষান্তরে আধুনিক রোপা আমনের আওতায় জমির পরিমাণ ২.৭৬ মি. হেক্টর।

খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে টেকসই (Sustainable) আমন-ফলনের বিকল্প নেই। এত বাধাবিপত্তি ডিঙিয়ে সেই লক্ষ্যে পৌছানো সহজ কথা নয়। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) স্থান ভেদে, সমস্যা ভিত্তিক সমাধানের জন্য আমনের কিছু আধুনিক জাত ও প্রযুক্তি বের করে রেখেছেন। এব্যাপারে ধান গবেষণার তদারকিতে মাঠ পর্যায়ের কৃষিকর্মকর্তাদেরকে প্রশিক্ষিত করা হয়। এগুলোর ঠিকমত কাজে লাগানোর দায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের। যতই সমালোচনা করা হোক না কেন আমার জানা মতে তাদের সদিচ্ছার কোনো অভাব নেই। তারপরও বাস্তব কিছু পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যেখানে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কিছুই করার থাকে না।

মাঠ-কর্মীরা জানেন শ্রাবণের পরে গেলে রোপা আমনের আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায় না। তাঁরা চাষিকে নিশ্চয়ই একথা বলেছেন। অথবা এ কথা চাষীও জানেন। কিন্তু যে জমিতে রোপা আমন করবেন সে জমিতে হয়তো পাট আছে। পাট তখনও কাটা হয় নাই। বা কাটা হলেও লোকের (শ্রমিক) অভাবে জাগ দেওয়া, আঁশ ছড়ানো, শুকানো ইত্যাদি করতে করতে ধান লাগানোর আসল সময় পার। অথচ আগের পরিকল্পনা মাফিক চাষি হয়তো তার পছন্দের কোনো জাতের বীজ (ব্রি ধান৩২) যোগাড় করে পাত (বীজতলায় বীজ ফেলা) দিয়ে রেখেছেন আগেই। বীজ তলায় চারার বয়স অনেক হয়ে গেছে। দেরি করে লাগালে ফলন আশানুরূপ হবে না। বেশি দেরি হয়ে গেলে অঘ্রানী ঠান্ডায় শিষই ফুটবে না। অর্থাৎ ফলন বাড়াতে যে ফলন-পার্থক্য (Yield gap) কমানোর কথা সেটা সম্ভব হয়ে উঠছে না। ব্রি ধান৩৩ একটি স্বল্প মেয়াদি জাত। বৃহত্তর ফরিদপুরের তো অনেক জায়গায় কৃষকরা ধান কেটে পিঁয়াজ বা গমের আবাদ করে থাকেন। তারা পাট কাটার মাস খানেক আগেই পাটের কাদা জমিতে গজানো (sprouted) বীজ বুনে সময়ের সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করে থাকেন। ভালো প্রযুক্তি। আমি দেখেছি এবারে অনেক জায়গায় এধরনের জমিতে চারা দাঁড়াবার আগেই ডুবে গেছে। যদিও বন্যা এবার তেমন হয়নি। তবে অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি জমে জলাবদ্ধতার কারণে এমনটি হয়েছে। প্রান্তিক-চাষিরা এই প্রাকটিস না করলেও পারতেন। কিন্তু গতবারের অভিজ্ঞতা ছিল ভালো। এবারে মার খাবে তা কে জানতো? চাষিকে হয়তো কিছু কাফফারা দিতে হবে। ঐ জমিতে আবারো সে ধান লাগাবে। এজন্য নিকটস্থ কোনো বড়-চাষির কাছ থেকে উপযুক্ত বয়সের চারা কিনতে হবে টাকার বিনিময়ে। আমন উঠতে দেরি হয়ে গেলে তার গম বা পিঁয়াজ ফসলও দেরি হয়ে যাবে।

ফলন কমে যাবে। অতএব উৎপাদন ঘাটতির সাথে লাভ-ক্ষতির শনির দশায় ধরা খাবে চাষি। আবার সময় মত বীজ বা ধানের চারা পাওয়া দুষ্কর। নাবি আমন নাইজার শাইল ভালো। এর চাউল ভালো কিন্তু ফলন কম। এর বিকল্প হিসাবে আছে বিআর২২ এবং বিআর২৩। চালের মানের দিক দিয়ে নাইজার শাইলের মত হলেও ফলনের দিক দিয়ে অনেক উন্নত। চাষিকে এগুলোর আবাদের পরামর্শ দিলে কোথায় পাবে এই জাতের বীজ। নাবি হিসাবে ব্রি'র সাম্প্রতিক সংযোজন ব্রিধান৪৬। ১৫ আশ্বিন পর্যন্ড় এক মাসের চারা লাগিয়ে বিআর২২ কিংবা বিআর২৩ থেকেও ভালো ফলন পাওয়া যায়। কিন্তু ব্রি ধান৪৬ এখনও সূতিগারেই আছে বলা যায়। বিআর২২, বিআর২৩ নিয়ে কিছু কথা বলা দরকার। এরা দিবাালোক সংবেদনশীল। দিবালোক সংবেদনশীলতা কি তা আমি আগেই বলেছি। আধুনিক ধান গবেষণার পীঠস্থান আন্ড়র্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে এই প্রপঞ্চটি খুব একটা গুরুত্ব পায়নি। সেখানে এই বিষয়ে গবেষণা হয়েছে। তবে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে ফুল আসার কারণে ধানচাষে নিবিড়তা আনা সম্ভব নয় বলে অনেক ধান বিজ্ঞানী আর এগুনোর প্রয়োজন মনে করেননি। কিন্তু বাংলাদেশের মত উষ্ণ এবং কিছুটা ঠান্ডা আবহাওয়াসম্পন্ন বন্যা প্রবণ ঋতুবৈচিত্র্যের দেশে উচ্চ ফলনশীল এবং আলোক-সংবেদী ধানের দরকার আছে বলে আমাদের বিজ্ঞানীরা অনেক বিজ্ঞানী মনে করেছেন। এব্যাপারে প্রখ্যাত ধান বিজ্ঞানী ড. মুনশি সিদ্দিক আহ্মাদ এর ভূমিকাই ছিল মুখ্য। এদেশের কৃষ্টি-কালচারের একটা বিরাট অংশ জুড়ে শাইল ধান। অথচ এমন একটা উচ্চ ফলনশীল ধান থাকবে না কেমন কথা! তাঁর নেতৃত্বে বিআর২২ এবং বিআর২৩ উদ্ভাবিত হয়। এই সিরিজের সাম্প্রতিকতম সংযোজন ব্রিধান ৪৬। ড. আহ্মাদ তাঁর এই অবদানের জন্য ১৯৯৬ সালে (তাঁর অবসরের অন্যূন দশ বছর পর) স্বাধীনতা পদকে ভূষিত হন। এই জাতগুলো বৈরী প্রতিবেশে, যেমন বন্যার পর নাবি আমন হিসেবে যথেষ্ট ফলন দেয়। কারণ যখনই লাগানো হয় শেষ কার্তিক-অঘ্রানে ফুল আসে। এই কারণে বেশি শীত পড়বার আগেই ধান পুরোপুরি বেরিয়ে (Flowering) যায়। অনেক সময় একই সাথে নিচু তাপমাত্রা (শীত) এবং পানির অভাব দুটোই একসাথে আসে। কিন্তু আলোক-সংবেদী হওয়ায় এই সংকটকাল ভর করবার বেশ আগেই ধান বেরিয়ে যায়। ফলে সম্ভাব্য চিটা হওয়ার হাত থেকে ফসল রক্ষা পায়। কিন্তু এই জায়গায় ব্রি ধান১১, ব্রি ধান৩১ বা স্বর্ণা হলে নির্ঘাত নষ্ট হয়ে যেত।

বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন রকমের সমস্যা দেখা যায়। আমন মওসুমে লবণাক্ত এলাকা, লবণ নেই এমনি ধরনের জোয়ার ভাটা এলাকার জন্য কোনো আধুনিক জাত ছিল না। জোয়ার ভাটা এলাকায় এখন ভালোমতই ব্রিধান ৪৪ এর আবাদ করা যায়। আর যেখানে লবণের সমস্যা আছে সেখানে ব্রিধান ৪০ ব্রিধান ৪১ বেশ খানিকটা মানিয়ে নিতে পারে বলে ভালো ফলন দেয়। আরেক সমস্যা ফহল চুবানি (Submergence) খাওয়া। ফসল প্রতিষ্ঠার কালে বা কিছু পরে বন্যায় চুবানি খেতে পারে । আমাদের দেশে ব্যপক এলাকা এই পরিসিস্থিতির শিকার হয় প্রতি বছর। ফলে লাগানো ধান পচে যায়। এই নীরিখে ধানগবেষণার অগ্রগতি বেশ ভালো। এখন পর্যন্ড় নির্দিষ্ট কোনো জাত বের না হলেও অদূর ভবিষ্যতে জাত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ইতোমধ্যে রংপরের কিছু এলাকায় Swarna Sub 1 ভালো করছে। আমাদের নিজস্ব জাত বিআর১১ থেকে উদ্ভূত BR11 Sub 1 বা অনুরূপ কিছু কৌলিক সারি নিয়ে গবেষণা এগিয়ে যাচ্ছে। মঙ্গা নিরসনে ব্রিধান ৩৩ এর ভূমিকা নিয়ে অনেক প্রশংসা করা হয়েছে। উত্তর বঙ্গে সামাজিক বৈরী পরিস্থিতি মঙ্গা কিন্তু আমন

মওসুমে হয়ে থাকে। এ সময় স্থানীয় শ্রমিকদের কোনো কাজ থাকে না। কাজের সন্ধানে অন্য জায়গায় যেতে হয় অথবা না খেয়ে থাকতে হয়। মঙ্গা এবং রংপুর শব্দ দুটো একে অপরের পরিপূরক হলেও কার্তিক মাসে এমন পরিস্থিতি হয় না এমন কোনো এলাকা নেই। এবং সেসব জায়গায় প্রয়োজনে এই ধরনের স্বল্পমেয়াদি জাতের ব্যবহার হতে পারে।

অর্থাৎ প্রযুক্তি কমবেশি আমাদের আছে। যা প্রয়োজন; তাহলো চাষির দোরগোড়ায় তা সময়মত পৌঁছে দেওয়া। এজন্য অপ্রতুল হলেও কিছু লোক নিশ্চয়ই আছে, তা বলেছি। তবে শুধু পরামর্শেই কাজ হয় না। চাষির দরকার যথাযথ বীজ, যথাযথ প্রযুক্তি। কোথায় পাবে সেই বীজ। আমাদের দেশে এসময়ে দুর্যোগ নতুন কিছু না। তারপরও আজ পর্যন্ড় প্রয়োজনে বীজের যোগান পাওয়া যায় এমন কোনো ব্যবস্থা নেই; অর্থাৎ বীজের বাফার স্টক নেই। ২০০৪ এর মত বন্যার পর পরই নাবি জাত বিআর২২, বিআর২৩ বা ব্রিধান ৪৬ এর মত জাতের বীজের দরকার হতে পারে। কবে কোথায় কেমন বন্যা হয় আমরা এখনও বলতে পারিনা। তাই আমাদের প্রতিবছরই একটা প্রস্তুতি থাকা দরকার যেন বিপদে চাষিদের পাশে দাঁড়ানো যায়। কারণ বীজের কোনো বিকল্প নেই। স্বাভাবিক অবস্থায় ভালো হয় এমন কিছু জনপ্রিয় জাত সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থার কাছে সহজে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রচলিত নয় বা বৈরী প্রতিবেশে ভালো হতে পারে এমন জাতের বীজ পাওয়া কষ্টকর। এত গেলো বীজের কথা। এবারে খরার কথায় আসা যাক। আগেই বলা হয়েছে বৃষ্টি-নির্ভর রোপা আমনে অন্ড়ত দুই অবস্থায় খরার প্রভাব পড়তে পারে। খরায় অর্ধেক থেকে পুরোপুরি ফলন নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। তাই খরা সহনশীল আধুনিক জাত বের করতে পারলে ভালো। তা যখন এখনও সম্ভব হয় নাই তাই সম্পূরক সেচই ফলন-রক্ষার অন্যতম উপায় বলে মনে হয়। এজন্য ব্রি-র সেচ প্রকৌশলীদের পরামর্শ হলো সময়মত সম্পূরক সেচ দেওয়া। কিন্তু এই সেচের ব্যবস্থা কিভাবে হবে? আমাদের প্রকৌশলীরা এসব সমস্যার বেশ কিছু সমাধান বের করেছেন। জমির মধ্যেই একপাশে ছোট্ট পুকুর করে জমিতে পানি দেওয়া যায়। সস্ড়া প্□াস্টিকের ফিতে পাইপ দিয়ে রাস্ড়ার পাশের খাত বা নিচু জলা জায়গা থেকে পানি তুলে অনেক দূরের জমিতে পানি টেনে নেওয়া যায়। সব সময় জলাবদ্ধ না রেখে বেশ বিরতি দিয়ে দিয়ে সেচ দেওয়া যায়। অথচ ফলনে এই বিরতির কোনো প্রভাব নেইা। পানি ব্যবস্থাপনা আধুনিক কৃষির প্রাণ। অথচ আমাদের কৃষিতে পানি ব্যবস্থাপনায় মারাত্মক অব্যবস্থাপনা। পানি নিয়ে সারা বিশ্বে হানাহনি করার সময় খুবই কাছে। অথচ দুঃখের বিষয় হলো, চাষি পর্যায়ে এই কথাটি সহজ করে বলার মতো একজনও বিশেষজ্ঞ নেই। একথা সেচ-নির্ভর বোরোর জন্য যতখানি সত্য তার চেয়েও বেশি সত্য বৃষ্টি-নির্ভর আমনের জন্য।

চাউল আর চাইলের বাজারের উপর আমাদের অনেক কিছু নির্ভর করে। বোরোর ফসল ভালো হয়েছে। আমনেও এমনটি আশা করা অমূলক না। এজন্য সরকারের সব প্রস্তুতির খবর আমরা জেনেছি। কিন্তু সব কিছু থেকেও কি যেন নেই। সরকারি ব্যবস্থাপনা, কৃষক এবং কৃষিবিশেষজ্ঞ এই ত্রয়ীর মধ্যে কোথায়ও না কোথায়ও কোনো দুর্বলতা নিশ্চয়ই আছে । আমাদের তা এখনই বের করা দরকার। এজন্য বিশ্ববিখ্যাত কৃষি বিজ্ঞানী প্রফেসর এম এস স্বামিনাথন বলেছেন, শুধুমাত্র কৃষিতাত্ত্বিক গবেষণা নয় কৃষিকে অর্থবহ করার তাগিদে গুর“ত্ব দিয়ে Public policy সংক্রান্ড় গবেষণাও হওয়া দরকার।

Rjevqi cwieZb Ges Uvbv‡cv‡o‡bi Kwl
AvMó 30, 2008, ˜wbK msev˜

এক জনমে নাকি যুগের হাওয়া বুঝা দায়। কিন্তু এযুগ কোন যুগ যে আমাদের অনেক কিছুই বুঝতে হলো। কেমন জলদি জলদি যেন বদলে গেল চার পাশের পরিবেশ। আমাদের ছোট গ্রাম খানার কথাই যদি ধরি। এর একমাইল পরিধির এপাশে ওপাশে যে ঝোড়-জঙ্গলগুলো ছিল তা আর নেই। যে ”ধামামারা”, ”বিলজোনা” আর ”সাওরাইলের” বিল বলে কিছু নিচু জলা জায়গা ছিল তাও বলতে গেলে নেই। কালের স্বাক্ষী হয়ে থাকার কথা ছিল যে ”বেহুলা” আর ”তারা” বট গাছ তারাও নেই। বিলের পাড়ে ”সীতেপাগলের” আশ্রম (আখড়া) আগলে রাখা বট ও পাঁকুড়ের যে বিরাট চাঁদোয়া ছিল তাও প্রায় বিরান হবার পথে। আগে এসব জায়গায় ভুতের নিবাস ছিল বলে আমরা বিশ্বাস করতাম। এখন সে ভুতের ভয়ও নেই। নেই আশ্রমের গাছের মগডালে রাতের পহরে পহরে ডেকে উঠা মহাজিয়েনি (দেশি একজাতের ঈগলপাখি) পাখিগুলো। কালিবাড়ির সেই উঁচু শিমুল গাছে ফি বছর বেড়াতে আসা ”কুরে” (একধরনে বড় আকারের পাখি) দম্পতির বাসাও নেই। নেই ”খোকার পুকুরের” এক কিনারে কড়ই গাছের আগ ডালে শোকুন ছানার গোঙানি। (এটাকেও আমরা ভুতের কান্না বলে জানতাম।) রাতের আঁধারে শিয়েলের সুরেলা হাঁক এখন কমই শোনা যায়। শোনা যায় না বেলা বাড়ার সাথে সাথে তিলে ঘুঘুর ডাক। বর্ষায় ডুবতে থাকা পাট আর আউশ ধানের জমির কিনার ঘেঁসে গুই সাপের ছুটাছুটি এখন তেমন চোখে পড়ে না। আমনের জমিগুলো আছে। সেখানে এখন আমন চাষের কোনো সুযোগ নেই। অথচ ঐ জমিগুলোর গা ঘেঁষে বাচ্চা রুই মাছদের জলকেলি আজও আমার মনের গহীনে সাঁতার কাটে। পাট কাটার পর বর্ষার জলে ভাসা পরিষ্কার জমিগুলোতে এক সময় নৌকার বাইচের চল ছিল। এখন কোনো বছর প্রচুর পানি হয়, আবার কোন বছর পানির দেখা নেই। আমার ভালো লাগতো আমনের জমি চীরে বাতাস বিহীন ভাদরের দুপুরে গ্রামের মানুষদের কোঁচ দিয়ে রুই মাছ ধরার দৃশ্য দেখতে। আবু ইসহাকের ”সূর্য দীঘল বাড়ী” উপন্যাসে এই বর্ণনা আছে। এই উপন্যাসকে ভিত্তি করে শেখ নেয়ামত আলী এবং মসিহ্ উদ্দিন শাকের যে ছবি বানিয়েছিলেন সেখানে এই দৃশ্যের কিছুটা অবতারনা আছে। এই যে অনেক কিছু নেই নেই বলা হলো– এই গুলো আর কিছুই না। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সূচক হিসাবে কাজ করছে বলে আমি মনে করি।

বিলগুলো ভরাট হয়ে যাওয়ার কারণ পলি পড়া। গঙ্গা বাহিত পলি হিমালয় এবং নদীর পাড় ভেঙে আসা। বন উজাড় করা পাহাড় বা নদীর পাড় ভাঙা উজানের পলিতে আমার গ্রামের খাল বিল ভরে গেল। জমিতে বালাইনাশক প্রয়োগের কারণে পাখি, পানির সাপ, মাছ ইত্যাদির সংখ্যা কমে গেল। সাথে এগুলোর উপর নির্ভরশীল নেউল-বেজী আর খেঁক শিয়ালগুলোও যথেষ্ট সংখ্যায় নেই বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। সাধারণ মানুষের গোচরে ঘটে যাওয়া এই ঘটনাগুলোতে কারো যেন কিছুই বলার ছিল না। মানুষের সাথে প্রকৃতির যে বোঝাপড়ার ঠাণ্ডা লড়াই, তার কাছে হার মেনে গেল নাকি ওরা! কার যে হার হলো কে জানে? শেষ ভালো যার সব ভালো তার। এশুধু আমার গাঁয়ের কথাই না। বলা যায় তৃতীয়বিশ্বের তাবদ্ গ্রামগুলোর একই দশা।

সম্প্রতি ঢাকায় সংঘঠিত (২৫-৩০ আগস্ট, ২০০৮) International symposium on climate change & food security in south Asia 'র সভাপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর এস এম এ ফায়েজ একটি জীবন ঘনিষ্ট চুটকি দিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। তিনি আবার তা শুনেছেন, এমনি এক অনুষ্ঠানে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. ক্যামেরন হেফবার্নের মুখ থেকে। চুটকিটা এমন- দুই গ্রহের সাক্ষাৎ হয়েছে। প্রথম গ্রহ দ্বিতীয় গ্রহকে বলল, তোমাকে এত কাহিল দেখাচ্ছে কেন? দ্বিতীয় গ্রহ তার জবাবে জানালো, *Homo sapiens* (মানুষ) এর সাথে ঘরবসতি আমার। ভয়ের কোনো কারণ নেই, প্রথম গ্রহের সোজা-সাপটা প্রতিক্রিয়া, ওরা অচীরেই বিলীন হয়ে যাবে।

এখানে আসলে জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়ানক পরিণতির কথা বলা হয়েছে। এই পরিণতির জন্য মানুষই দায়ী। জীবনের প্রয়োজনে মানুষকে বাঁচার জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে। আর সে সংগ্রাম হলো কৃষি এবং শিল্পে বিপ্লব ঘটানো। ফলে বাতাসে গ্রীণহাউজ গ্যাস (কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন এবং নাইট্রাস অক্সাইড) বেড়ে গেছে লক্ষ্যযোগ্য মাত্রায়। শিল্প বিপ্লবের আগে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং মিথেনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৮০ পিপিএম এবং ৭১৫ পিপিবি। কিন্তু ২০০৬-এ এই পরিমাণগুলো দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৮১ পিপিএম এবং ১৭৮২ পিপিবি। একই ভাবে নাইট্রাস অক্সাইডের পরিমাণ ছিল শিল্প বিপ্লবের আগে ২৭০ পিপিবি এবং ২০০৬ এ ৩২০ পিপিবি। গ্লোবাল ওয়ার্মিংএ কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন এবং নাইট্রাস অক্সাইডের অবদান হলো যথাক্রমে ৬৩%, ১৮.৬% এবং ৬.২%। কার্বন ডাই অক্সাইড বৃদ্ধির কারণ জীবাশ্ম তেল পুড়ানো। মিথেন ও নাইট্রাস অক্সাইড বৃদ্ধির জন্য প্রধান আসামী করা হয় কৃষিকেই। ২০০৫ এর এক হিসেবে নির্গত মোট গ্রীন হাউস গ্যাস এর ১০-১২ % এসেছে কৃষি খাত থেকে। কৃষির প্রয়োজনে জঙ্গল সাফ করতে হয়েছে। মাটির উপরে ঘাসের আস্তরণ পরিষ্কার করতে হয়েছে। মাটির যে সহনশীলতা বলে কিছু আছে তা কারো জানা ছিল না বোধ হয়। মাটি দুর্বল হয়ে গেছে। নেংটা মাটির পানি ধরে রাখার ক্ষমতা কমে গেছে। ক্রমাগত ফসল উৎপাদন ও খনিজায়ন প্রক্রিয়ায় মাটির যে "জৈব পদার্থ" তা প্রায় শেষ। মাটির প্রাণ বলে পরিচিত চোখের আড়ালের ব্যস্ত আনুজৈবিক জগৎ, সেখানেও মারাত্মক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে। বিবেচনাহীন সার ও বালাই নাশকের অপপ্রয়োগের কারণে এই অবস্থা এবং আরও হবে বলে ধরে নেওয়া যায়।

এই গ্রীনহাউজ গ্যাসগুলো কারা বেশি ছাড়ছে – গরীব বিশ্বের ব্যবহৃত ধানের জমি, পশুরপাখির খামার? নাকি উন্নত বিশ্বের কলকারখানা আর রাস্তা-ঘাটের ধোঁয়া? এনিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। তবে উপরের বর্ণনায় তো কিছুটা আন্দাজ করা যায় কারা এর জন্য দায়ী। তবুও বিতর্ক হয়। উন্নত বিশ্ব প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কিয়োতো প্রটোকল মানার জন্য। তারা কথা দিয়েছে উক্ত গ্যাসগুলোর নির্গমন তারা নির্দিষ্ট মাত্রার মধ্যে কমিয়ে আনবে। দেখা যাক চলতি বছর থেকে ২০১২'র মধ্যে তাদের কথা ও কাজের মধ্যে কতখানি মিল পাওয়া যায়। তবে সেই বাঁশের আগায় বসে কর্কশ স্বরে ডাকা কাকের প্রতি অভিশাপ দেওয়ার কথা একবার স্মরণ করা দরকার। কারো অভিশাপে বাঁশ গাছের আগা পর্যন্ত যদি পানি হয় তা হলে শুধু কাক মরবে না সবাই মরবে।

একথা সত্য যে ন্যুনতম কৃষি বিষয়ক কোনো কর্মকান্ড জীববৈচিত্র্যে কিছু না কিছু প্রভাব ফেলে। কিন্তু এই কাজের কোনো বিকল্প নেই। কৃষিতে পরিবেশের প্রভাব চিরকাল ছিল এবং থাকবে। আবার পরিবেশের উপরও কৃষির প্রভাব আমরা বেশ বুঝতে পারছি। অর্থাৎ কৃষি এবং পরিবেশ একে অপরকে ভালোভাবেই প্রভাবিত করে থাকে। তথাকথিত আধুনিক কৃষির শুরুর সময়টাতে ছিল ক্ষুধা নিবৃত্তির তাগিদ। তাই পরিণতির কথা কেউ ভাবেনি। আর ভাবলেই বা কি হতো? না খাওয়ার চেয়েতো চিড়ে খাওয়া খারাপ না। তবুও গত শতাব্দীর শেষ দিক থেকেই গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে চারিদিক তোলপাড় শুরু হয়। বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় মানবতাবাদী সংগঠনগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। গ্রীণ হাউজ গ্যাসের কারণে ওজন স্তর ঝাঁজরা হয়ে যাওয়ার খবর সবাইকে বিচলিত করে। সাম্প্রতিক কালে গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে আরো ভয়াবহ সব কথা শুনা যাচ্ছে। ২০০৫ এর এক সমীক্ষায় দেখা গেছে সাইবেরিয়াতে ১৯৬০ এর পরে গড়ে প্রায় ৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা বেড়ে গেছে। আরেক সমীক্ষায় বাংলাদেশের জন্য এই পরিমাণ দেখানো হয়েছে ২০৩০ নাগাদ ১ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং ২০৫০ নাগাদ ১.৪ ডিগ্রী। সাইবেরিয়ার তুলনায় এই পরিমাণ কম হলেও রক্ষে নেই। কারণ বরফ গলছে সাইবেরিয়ায় এবং হিমালয়ে। সেটা যে গড়িয়ে গড়িয়ে উষ্ণ ভূমি অর্থাৎ আমাদের দিকেই ধাবিত হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। শ্রী অন্নদাশঙ্কর লিখেছিলেন,

"এলো বান সর্বনেশে গেল ভেসে হিমালয়ের নদীর পাড়
ডিব্রুগড়ে বাঁধ ভেঙেছে ঢাকার গ্রামে হাহাকার।"

একারণেই একুশ শতকের শেষ নাগাদ সাগরের উচ্চতা এক মিটার বেড়ে যাওয়ার কথা বলছেন অনেকে। তাই যদি হয় তবে বাংলাদেশের অনেক পরিমাণ কৃষি জমি তলিয়ে যাবে। বিগত শতাব্দীর আশির দশকে সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে সমব্যাথী মালদ্বীপের মাননীয় প্রেসিডেন্ট মামুন আব্দুল গায়ুম বলেছিলেন বাংলাদেশের প্রায় ৪০% ভূমি ডুবে যেতে পারে সাগরের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে। তখন মাননীয় প্রেসিডেন্ট মামুনের এই কথা আমরা হালকা ভাবেই নিয়েছি। কিন্তু তাঁর দূরদৃষ্টি সম্পন্ন প্রজ্ঞার অবশ্যই প্রশংসা করতে হয় আজ। সাগরের পানি যদি ফুলে উঠে (উঁচু হয়ে যায়) তবে বিশ্বের ধান উৎপাদন কারী বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম, মায়ানমার ও আরও কিছু সাগর পাড়ের দেশগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হবে। অনেক এলাকা আবাদযোগ্য জমি থাকলেও সেখানে নোনাপানির আনাগোনা বেড়ে যাবে।

গত বছরে Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC) প্রতিবেদন অনুযায়ী আবহাওয়ার পরিবর্তন কৃষির কি হাল হতে পারে তার একটা সারাংশ দেওয়া হলো।

> উষ্ণ ও অব উষ্ণ মন্ডলে খরা ও বন্যার প্রভাব বাড়বে এবং ফলন কমে যাবে। অক্ষাংশের উপর দিকে (High latitude) ১-৩ ডিগ্রী তাপমাত্রার বাড়া পর্যন্ত অনেক জায়গায় ফলন বাড়তে পারে। তাপমাত্রা এর চেয়ে বেশি হলে ফলন আর না বাড়ার সম্ভাবনা। বৃষ্টিপাতের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। পক্ষান্তরে উষ্ণ এবং অবউষ্ণ এলাকা এবং

শুষ্ক এলাকাসমূহে (Lower latitude) বৃষ্টি পাতের পরিমাণ কমে যাবে। ফলে খরা আক্রান্ত এলাকা বেড়ে যাবে। এ সমস্ত এলাকায় যদি ১-২ ডিগ্রী তাপ মাত্রাও বেড়ে যায় তবে সমূহ ঝুঁকির সম্ভাবনা। অধিকতর গরম, আর্দ্রআবহাওয়ায় রোগবালাই এবং পোকামাকড়ের আক্রমণ বেড়ে যাবে।

এছাড়াও গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর কারণে ফসল আবাদের সময়ে পরিবর্তন আসবে। আমাদের দেশে আধুনিক ধান লাগানোর জন্য মওসুম অনুযায়ী একটা প্রেসক্রিপশন দেওয়া ছিল। কিন্তু সেখানে ইতোমধ্যেই পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। তাপমাত্রা বাড়ার ফলে ফসলের জীবনকাল কমে আসছে। স্বাভাবিক ভাবেই ধানের ফলন কমতে থাকবে। আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অনেক ফসল তাদের সর্বোচ্চ সহ্য সীমার কাছাকাছি অবস্থায় চাষ হচ্ছে। আরেকটু তাপ মাত্রা বাড়লে তাদের ফলনও কমে যাওয়ার আশংকা উল্লেখযোগ্য হারে। আমাদের মতো দেশে বৃষ্টিপাত এবং খরা দুটোরই প্রকোপ বেড়ে যাওয়ার আশংকা। কারণ সমভাবে বিস্তৃত না হওয়ায় কখনও অতিবৃষ্টিতে ফসল মার খাবে, কখনও বা অনাবৃষ্টিতে।

গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর সমস্যাসমূহ উৎরানোর লক্ষ্যে IPCC 'র পরামর্শ হলো-

- ফসল রোপণ ও বপনের তারিখে পরিবর্তন আনা
- একাধিক জাত বা ফসলের আবাদ করা
- বিকল্প শষ্যের জাত উদ্ভাবন বা উন্নয়ন করা
- খরা এবং তাপ সহনশীল জাতের উদ্ভাবন করা
- ফসল বিন্যাসে নতুনত্ব আনা বা ফসল বিন্যাসের বহুল ব্যবহার করা
- টেকসই সার ব্যবসস্থাপনা ও আবাদ পদ্ধতি ব্যবহার করা
- আধুনিক সেচ ব্যবস্থা চালু করা
- গবাদি-পশু ব্যবস্থাপনা আধুনিকীকরণ করা
- কৃষি বনায়ন অনুসরণ করা
- খরা, বন্যা, ইত্যাদি দুর্যোগের বেলায় যথাযথ পূর্বভাষের ব্যবস্থা করা

এই সমস্যা মোকাবিলার তাগিদে আমাদেরও ভাবতে হচ্ছে। বস্তুতপক্ষে দেশের অধিকাংশ সরকারি, বেসরকারি অফিসে এই পরিস্থিতি নিয়ে কার্যক্রম চলছে। সভা সমিতি হচ্ছে। ওয়ার্কিং পেপার তৈরি হচ্ছে। কৃষির মধ্যে গ্লোবাল ওয়ার্মিংএ ধানের বদনাম বেশি। তাই ধান বিজ্ঞানদের পিছিয়ে থাকার অবকাশ নেই। আপতত চিন্তা হওয়া উচিৎ আমাদের দেশে ধানের জমি গ্লোবাল ওয়ার্মিংএ কতখানি ভূমিকা রাখছে। এবিষয়ে এখানে কাজের এখনও তেমন পরিকাঠামো গড়ে উঠেনি। আমাদের এখানে তেমন কাজ না হলেও আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ বিশ্বের বেশ কিছু অগ্রসরমান

গবেষণাগারে ধানের জমি থেকে মিথেন নির্গমনের পরিমাণ নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছে। বলা বাহুল্য উন্নত বিশ্ব-ভিত্তিক গবেষক বা গবেষণাগার থেকে যে ফলাফল পাওয়া গেছে তা আমাদের জন্য খুব একটা ভালো খবর না। অর্থাৎ আমাদের ধানের জমিকে দোষারোপ করা হয়েছে। এক একটা ধানের নাড়াকে (Straw) মিথেন নির্গমনের চিমনি হিসাবে তুলনা করা হয়েছে। তারপরের প্রচেষ্টা হতে পারে এমন জাত বাছাই করা বা উদ্ভাবন করা যেগুলো মিথেন কম নির্গমন করে। বা এমন কোনো আবাদ প্রযুক্তি বের করা যেখানে মিথেন কম পরিমাণে নির্গত হয়। যেমন ধানের জমি না পেঁকিয়ে, বেড করে চাষ করা, আউশ ধানের মত করে শুকনো জমিতে চাষ করা ইত্যাদি ইত্যাদি। এভাবে চাষ করলে যথাযথ ফলন পাওয়ার সম্ভাবনা কম। আবার মিথেন নির্গমন নিবৃত করা গেলেও নাইট্রাস অক্সাইড নির্গমন তো বন্ধ করা যাবে না। তার অর্থ ধানের জমিকে গ্রীন হাউস গ্যাস সরবরাহের বদনাম কাঁধে নিয়ে চলতে হবে চিরকাল। ভয় হয়, উন্নত বিশ্ব না বলে বসে, ধান চাষ আর করা যাবে না। যাহোক অদূর ভবিষতে যেহেতু মান সম্পন্ন সেচের পানির দারুন অভাব হবে তাই পানিরও সদ্ব্যবহার করতে হবে। অল্প পানি দিয়ে ধান চাষের কোনো প্রযুক্তি বের করতে পারলে ধানের জমি থেকে মিথেন নির্গমন প্রতিরোধে কিছুটা কাজ হতে পারে বলে আমার বিশ্বাস।

বিজ্ঞানীরা এক নম্বরে রেখেছেন প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকতে পারে এমন জাত ও শষ্য বের করা। পরিবেশ বান্ধব এবং টেকসই ধান ভিত্তিক শস্যক্রম বের করা আরেকটি গুরত্বপূর্ণ কাজ। সাথে কিছু কিছু নতুন ফসলের আমদানি করা দরকার। একই সাথে আমাদের খাদ্যাভ্যাসের যেন কিছুটা পরিবর্তন আনা যায় সেদিকটা খেয়াল করা দরকার। এব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী এবং নীতিনির্ধারকদের বুঝাপড়ার প্রয়োজন আছে। তাহলে আমাদের এই টানাপোড়েনের কৃষি নিয়েই একভাবে পার পাওয়া যাবে।

djb cv_K¨: wKfv‡e Kgv‡bv hvq?

†m†Þ¤i 6, 2008, ˜wbK msev˜

ধান আমাদের জন্য একটি সংবেদনশীল ফসল। একজন বাংলাদেশীর চালের দরকার বছরে ১৬৬ কেজি। খাদ্যমানের হিসাবে মোট ক্যালরি ও প্রোটিনের সিংহভাগ আসে ধান থেকে (যথাক্রমে ৭৭ এবং ৬৫ শতাংশ)।   মোট জনশক্তির ৬৬ শতাংশ ধান উৎপাদন এবং আনুষঙ্গিক কার্যক্রমের সাথে জড়িত। জিডিপিতে ধানের অবদান ১১ শতাংশ। তাই জন সুস্থিরতার জন্য এর সার্বক্ষণীক সরবরাহ নিশ্চিত করা জরুরী। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) একটি হাইব্রিড ধানসহ মোট ৪৭ টি উন্নত জাত (বোরো:২১, বোনা আউশ: ৬, রোপা আউশ: ১১ ও:রোপা আমন:২০) মাটি, পানি ও সার ব্যবস্থাপনার ৫০ এর অধিক প্রকার প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে এই প্রচেষ্টায় সামিল আছে। স্বাধীনতার পর থেকে আজ অবধি খাদ্য উৎপাদন প্রায় তিনগুণ করা সম্ভব হয়েছে। কয়েকবছর ধরে দেশ খাদ্যে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক নাবি-অকাল বন্যা, এবং সিডরের কারণে ধান ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হওয়ায় দেশ কিছুটা অসুবিধার মুখোমুখি হয়। তবে বোরো ফলন ভালোমত হওয়ায় দুর্ভিক্ষের কালো ছায়া কিছুটা দূরে সরে গেছে বলে মনে হয়।

খাদ্য সমস্যা বাড়ানোর জন্য সরকারসহ সবাই ফলন বৃদ্ধির কথা বলে থাকেন। কিন্তু সেটা কীভাবে সম্ভব, বা কতখানি সম্ভব বা সম্ভব কিনা তা ভেবে দেখার সুযোগ কম। যাহোক সবাই যখন চায়, তাই উৎপাদন বৃদ্ধির উপায়গুলো কিছুটা যাচাই-বাছাই করা দরকার। সাধারণভাবে ফলন বাড়ানোর দুটো উপায় আছে। এক: আবাদি আওতা সম্প্রসারণ এবং দুই: সরাসরি ফলন বৃদ্ধি।

দেশে বর্তমানে মোট প্রকৃত আবাদযোগ্য জমি ৮ মিলিয়ন হেক্টরের কাছাকাছি। মোট ধানী জমির পরিমাণ ১০ মিলিয়ন হেক্টর (ধান বছরে এক জমিতে একাধিকবার করা যায়)। ধানীজমির পরিমাণ ১৯৭০ থেকে ২০০১ পর্যন্ড় তেমন হের-ফেরের কথা শুনা যায়নি। তবে বর্তমানে এই পরিসংখ্যান একই আছে বলে ধরে নেওয়া উচিৎ হবে না। আবাদি জমি নগরায়ন, রাস্ড়াঘাট ও ইটেরভাটা নির্মাণ, উপরের মাটি বিক্রয় ইত্যাদি কারণে দৈনিক ২২০ হেক্টর করে জমি কমছে বলে কোনো কোনো পরিসংখ্যানে দাবী করা হচ্ছে। এর অধিকাংশই ধানের অনুকূল পরিবেশের জমি। অর্থাৎ বলা যায়, ধানের জমিতো বাড়ছে না বরং কমছে। আবাদি ধানী জমির ৭৮ শতাংশ জমিতে (এ বছর সরকারীভাবে বিদেশী হাইব্রিড ধান চাষে উদ্বুদ্ধ করায় এই পরিসংখ্যানের কিছুটা পরিবর্তন হতে পারে) ব্রি উদ্ভাবিত আধুনিক ধানের চাষ করা হচ্ছে। অতএব প্রকৃত ধানের আবাদযোগ্য জমি বৃদ্ধির সম্ভাবনা ক্ষীণ। বাকী জমি আদৌ ধান চাষের আওতায় আনা যাবে কিনা বা আনা উচিৎ কিনা তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্ড়া করে দেখার আছে। এখন যা হচ্ছে তা হলো স্থান বিশেষে সেচ সুবিধে দিয়ে আউশের জমিতে বোরোর বা আমনের পর অনেকটা জোর করেই বোরোর জমিতে রূপান্ড়রের চেষ্টা চলছে। অনেক সময় নির্দিষ্ট কোনো শষ্য বিন্যাস সীমিত করে (তেল, ডাল, সবজি বা পাট জাতীয় শস্যের জায়গা সংকুচিত করে) আধুনিক জাতের ধান চাষের জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। এভাবে ফলন বাড়ানো সম্ভব হলেও তা জীববৈচিত্র্য ও গণপুষ্টি (Community nutrition) নির্বাহের জন্য মারাত্মক হুমকির কারণ হতে পারে। তাই আধুনিক জাতের ধানের আবাদ-আওতা আরও সম্প্রসারণের ব্যাপারে একটা সীমারেখা টানা দরকার। সেই সাথে খেয়াল রাখা জর“রী যেন মূল্যবান ধানী জমির পরিমাণ যেন কোনোক্রমেই আর কমে না যায়।

তাই ফলন বাড়ানোর যুক্তিযুক্ত উপায় হলো সরাসরি (Vertical expansion) ফলন বাড়ানোর চেষ্টা করা। এজন্য ফলন পার্থক্য (Yield gap) বিষয়টি বিশেষ ভাবে বিবেচনায় আনতে হবে। ব্রি-উদ্ভাবিত জাতগুলোর সাধারণ অবস্থায় গড় ফলন হেক্টরে ৫ টন। কিন্তু চাষি পর্যায়ে এই ফলন ২-৩ টন পর্যন্ড় কম হয়ে থাকে। এইযে ঘাটতি ফলন বা ফলন পার্থক্য যা ভালো পরিচর্যা করলে হয়তো হতো না। বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। ধানের ফলনকে ৩ পর্যায়ে ভাগ করা যায়।

- সর্বোচ্চ ফলন: পানি, পুষ্টি উপাদান এবং রোগবালাই ব্যবস্থপনা যদি সর্বোত্তম হয় তবে কোনো আধুনিক জাত তার কৌলিতাত্ত্বিক ক্ষমতা অনুযায়ী ফলন (সর্বোচ্চ ফলন) দিতে পারে। এক্ষেত্রে আবহাওয়া একমাত্র প্রপঞ্চ যা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। তবে বপন ও রোপণ সময়কে নিয়ন্ত্রণ করে সম্ভাব্য ভালো আবহাওয়ার জন্য চাষের সময় বেছে নেওয়া যেতে পারে। এই অবস্থায় ব্রির একটি জাত (ব্রিধান২৯) বোরো মৌসুমে হেক্টরে ১০ টন বা তার

বেশিও ফলন দিতে সক্ষম। বিশেষ ব্যবস্থাধীনে পরিচালিত কোনো ফলন পরীক্ষা কার্যক্রমে এই মাপের ফলন পাওয়া সম্ভব।

- অর্জনযোগ্য ফলন: সর্বোচ্চ ফলন থেকে অর্জনযোগ্য ফলন কম। জাত ভালো হলেও প্রধানত পুষ্টি উপাদান এবং পানির সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনার অভাবে যে ফলন সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে না তাই অর্জনযোগ্য ফলন। একজন প্রশিক্ষিত চাষী একজন কৃষি বিশেষজ্ঞর তত্ত্বাবধানে এই ফলন পেতে পারেন। এভাবে ব্রি'র কোনোজাত বোরো মৌসুমে ৬-৮টন ফলন দিতে সক্ষম। সর্বোচ্চ ফলন এবং অর্জনযোগ্য ফলন-এর যে পার্থক্য তা djb cv_K¨ 1 বলে সঙ্গায়িত করা হয়েছে।
- প্রকৃত ফলন: পোকামাকড়ের এবং রোগ বালাইয়ের প্রভাবে যখন অর্জনযোগ্য ফলন পাওয়া সম্ভব হয় না তখন যে ফলন পাওয়া যায় তাহলো প্রকৃত ফলন। অর্জনযোগ্য ফলন এবং প্রকৃত ফলন-এর পার্থক্যকে djb cv_K¨ 2 বলে সঙ্গায়িত করা হয়েছে।

মাঠ পর্যায়ে djb cv_K¨ 2 কে বিবেচনা করলেই আমাদের যথেষ্ট ফলন না পাওয়ার কারণগুলো স্পষ্ট হয়ে যায়। ফলন পার্থক্য-১ কে জ্ঞানের পার্থক্য (knowledge gap) ফলন পার্থক্য-২ কে জ্ঞান ও অর্থনৈতিক সামর্থ (economic capability) এবং আমলাতান্ত্রিক কিছু জটিলতা এই সবকিছুর পার্থক্য বললেও অত্যুক্তি হয় না।

ফলন পার্থক্য ২ কমিয়ে আনা বা ফলনকে চলনসই পর্যায়ে ধরে রাখার স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি কিছু পরিকল্পনা থাকতে হবে। এ বিষয়ে দেশের সংশি-ষ্ট পরিকল্পনাবিদগণ নিশ্চয়ই অনেক কিছু ভাবছেন এবং প্রয়োগের চেষ্টা করছেন। তারপরও আমরা ফলন পার্থক্য তেমন একটা কমাতে পারছি না। অথচ এই পার্থক্য যে কমানো সম্ভব কয়েক বছর আগে প্রমাণ পাওয়া গেছে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেশের সবগুলো চাষি পর্যায়ের কার্যক্রমে ফলন পার্থক্য কমিয়ে আনা গেছে। এতে বিশ্বাস করাবার কারণ আছে যে দেশে প্রযুক্তির অভাব নেই। কিন্তু সমস্যা হলো দেশ ব্যাপী প্রযুক্তি ছড়িয়ে দেওয়া বা সাধারণের বোধগম্য করা। এজন্য আরও কিছু জোর কর্মসূচি থাকা দরকার। এই সমস্ড় কার্যক্রমে দেশের বড় বড় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে বলে মনে হয়। এজন্য উপজেলা পর্যায়ে চাষিদেরকে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে আধুনিক ধান বিজ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। গ্রীনহাউস ও আনুসঙ্গিক কারণে ফসলের উপর যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ছে এবিষয়ে তাদেরকে ভালো করে বুঝাতে হবে। কেন ফলন কমে যায় এবং কীভাবে ফলন বাড়ানো যায় তা সহজ ভাবে তাদের কাছে উপস্থাপন করতে হবে। এজন্য মাঠকর্মীদেরকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত হতে হবে। কৃষি বিষয়ক জ্ঞানের পাশাপাশি সামাজিক, মনস্ড়ত্ত্বিক ইত্যাদি বিষয়ে কিছুটা হলেও পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে।

গবেষণাগার থেকে অবমোচনকৃত জাতসমূহের প্রত্যেকটির একান্ড় কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। একটা জাতের ফলনক্ষমতা বেশি হলেও তার কিছু দুর্বল দিক থাকতে পারে। আবার আরেকটি জাত ফলন কিছুটা কম দিলেও তার হয়তো বালাই প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে। সেগুলোকে মাঠ পর্যায়ে পরিচিত করতে হবে। এখন পর্যন্ড় ব্রি'র অধিকাংশ জাত অনুকূল পরিবেশে ভালো

করে। বৈরী পরিবেশ যেমন লবণাক্ত এলাকা, অলবণাক্ত জোয়ারভাটা এলাকা, বন্যা পুনর্বাসনের জন্য নাবি রোপা বা কাদাময় জমিতে বোনার জন্য ব্রি বেশ কিছু উপযোগী জাত বা প্রযুক্তি আছে। চাষী পর্যায়ে মান সম্পন্ন বীজ ও সারের সরবরাহ সময়মত সরবরাহের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। এজন্য মৌসুম শুর"র অন্যুন তিনমাস আগেই একটি কর্ম-পরিকল্পনা গ্রাসর"ট পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়া দরকার। চাষীদেরকে সহজ শর্তে স্বল্পসুদে ঋণের ব্যবস্থা করা উচিৎ। প্রতীকী ভর্তুকীর পরিবর্তে যথেষ্ট ভর্তুকীর ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। বীজের বাফার স্টক বা আপদ্ কালীন মজুদ থাকা উচিৎ। শস্য বীমা চালু হলে চাষিদের কিছুটা নিরাপত্তাহীণতা দূর হতো।

এছাড়াও মাঠ পর্যায়ে যা যা করা জর"রী তাহলো-

শস্য, মৃত্তিকা ও গাছের পুষ্টি ব্যস্থাপনার সমন্বিত প্রয়োগ দরকার। মৌসুম ও পরিবেশ ভেদে জাত নির্বাচন করতে হবে। মাটি পরীক্ষা করে গাছের প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদানের বিদ্যমান পরিস্থিতি যাচাই করে নিতে পারলে খুবই ভালো। সম্ভব না হলে কৃষি-পরিবেশ অঞ্চল ভেদে মাটির উর্বরতা কেমন হতে পারে তা কিছুটা ধারনা করার উপায় আছে। এজন্য অভিজ্ঞ কৃষিবিদের সাথে আলাপ করতে হবে। তারপর মাটির প্রকৃতি অনুসারে ব্রি-র সার সুপারিশমালা সঠিক নিয়মে অনুসরণ করতে হবে। জমি প্রস্তুতির শুর" থেকে পানি ও প্রয়োজনীয় সব সারের যোগান নিশ্চিত করতে হবে। এমন যেন না হয়; টিএসপি পেলাম না তো দিলাম না বা কম পেলাম তো কম দিলাম। এ অবস্থা ভালো ফলনের জন্য মোটেই আশাপ্রদ নয়। তবে টিএসপি বা এমপি সার একবার দিলে পরের মওসুমে কতটুকু দিতে হবে বা আদৌ দিতে হবে না তা বিশেষজ্ঞর কাছ থেকে জেনে নিতে হবে। নাইট্রোজেন সারের পরিমিত ব্যবহারের জন্য লীফ কালার চার্ট ব্যবহার করতে পারলে ভালো। এই সারের ব্যবহার উপযোগিতা বাড়ানোর জন্য বোরো মওসুমে গুটি ইউরিয়া ব্যবহার করা যেতে পারে। সারের ব্যবহার অবশ্যই সুসম হতে হবে। যে সার যখন ব্যবহার করার কথা তখনই তা করতে হবে। গাছের বৃদ্ধি পর্যায় সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞান থাকতে হবে। নাইট্রোজেন সারের প্রয়োগের ব্যাপারে এই বৃদ্ধি পর্যায়ের গুর"ত্ব অপরিসীম। মাটিতে অবশ্যই জৈব সার যেমন গোবর, সবুজ সার বা অ্যাজোলা প্রয়োগ করে মাটির জৈব উপাদান বাড়ানো উচিৎ। মাটিতে যথেষ্ট জৈব উপাদান না থাকলে প্রয়োজনীয় সার প্রয়োগ করেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। পানির ব্যবহারের ব্যাপারে ধান গবেষণার সুনির্দিষ্ট সুপারিশ আছে। এবং তা সঠিক নিয়মে পালন করতে হবে। জমি অবশ্যই আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। রোগবালাই ও পোকা মাকড়ের ব্যাপারে সবসময় সতর্ক থাকতে হবে। সব সময় মাঠ পরিদর্শন করে, আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করে এবং ব্রি-উদ্ভাবিত রোগ বা পোকামাকড়ের ক্যালেন্ডার দেখে কখন কোন বালাইয়ের আক্রমণ হতে পারে সে সম্বন্ধে একটা ধারনা করা সম্ভব। শস্য/জাত বিন্যাস, ব্যবহৃত জাতের নিজস্ব সহনশীলতা উপর ভিত্তি করেও বালাই ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আগাম প্রস্তুতি নেওয় সম্ভব। বালাই প্রতিরোধের জন্য আইপএম উত্তম। অপ্রয়োজনীয় কীটনাশক বা বালাইনাশকের ব্যবহার থেকে দূরে থাকতে হবে। প্রয়োজনে কৃষিকর্মর্তার সাতে আলাপ করে ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। মৌসুমভেদে ফসল ব্যবস্থাপনা ভিন্ন হয়ে থাকে। কোন মৌসুমে কত তারিখের মধ্যে কত বয়সের চারা রোপণ করতে হবে তা ব্রি নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। বর্ধিত ফলন পেতে হলে উক্ত সুপারিশ অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। কোনো বৈরী অবস্থার কারণে যথাসময়ে রোপণ না করতে পারলে পরিস্থিতি সাপেক্ষে কী ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে, এ ব্যাপারেও ব্রি'র সুপারিশ

অনুসরণ করতে হবে। শুধুমাত্র ফলন না, কৃষিতাত্ত্বিক, শারীরবৃত্তীয়, বালাই প্রতিরোধ সংক্রান্ড় যাবতীয় গুণাগুণ নানামুখী পরীক্ষা-কার্যক্রমের মাধ্যমে উপযোগী প্রমাণ হলেই কোনো nvBiieW avb (বাইরে থেকে আমদানি করা) জাত হিসাবে স্বীকৃতি পাবে। গবেষণার প্রাথমিক পর্যায়ের কাজগুলো ব্রি-র আওতায় করতে পারলে ভালো। বাইরে থেকে আমদানী করা বীজ জ্ঞাত-অজ্ঞাতসারে কোনো বিশেষ রোগ বা পোকাড়ের জীবাণুর বহন করতে পারে। তাই ধানের বীজের কোয়ারান্টাইন ব্যবস্থায় কঠোর হতে হবে।

পরিশেষে ধান কাটা থেকে শুরু করে ঘরে তুলা পর্যন্ড় বিশেষ যত্ন নিতে হবে। দেখা গেছে এই সময়ে চাষিরা খুব একটা খেয়াল করে না। ফলে উলেখযোগ্য পরিমাণ ফসলের অপচয় হয়ে যায়। বীজ ধানের (যা পরবর্তী ফসলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ) মান বজায় রাখার জন্য কর্তনোত্তর ধানের পরিচর্যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

একজন শিক্ষিত বা সচেতন চাষিকে তার নিজের প্রয়োজনেই এসব করতে হবে। সাথে একজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে দিতে পারে। তাহলেই জ্ঞানের পার্থক্য কমিয়ে আনার সাথে সাথে ফলন পার্থক্যও কমিয়ে ফেলা সম্ভব হবে। এবং এভাবেই খাদ্য নিরাপত্তার শক্ত ভিত তৈরি হবে।

‡jvK weÁvb Ges K…wl

†m‡Þ¤i 7, 2008, ˆ`wbK mgKvj

কোন খেয়ালে একদিন মাকে বলছিলাম, কোন ধানটা খরায় ভালো হয়। আমার মা সাধারণ ঘর-গেরস্থালি করা পরিবার থেকে আসা। চাষবাসের সাথে সরাসরি যোগাযোগ আছে। হাতের কাজ ফেলে আমার দিকে অবাক চোখে চেয়ে থাকলেন কিছু সময়; তারপর আস্ড়ে করে জবাব দিলেন; *"ক্যা, নড়ই ধান"* । আমি পেশাগতভাবে কখনও কখনও দেশাল ধানের মধ্য থেকে ভালো কোনো গুণ আছে, এমন কিছু জার্মপাজম খুঁজে বের করবার চেষ্টা করে থাকি। আমাদের দেশে ধানের যে জাত বৈচিত্র্য আছে পৃথিবীর আর কোথাও তা নেই। এই যে জাত বৈচিত্র্য তা কিন্তু এমনি এমনি আসেনি। শত শত বছর ধরে শত শত লোক- বিজ্ঞানীর নিরন্ড়র গবেষণার ফল। আজ থেকে প্রায় ৮০-৯০ বছর আগে প্রখ্যাত ধান বিজ্ঞানী ড. জি পি হেক্টর বলেছিলেন এদেশে নাকি একসময় আঠার হাজার ধানের চাষ হতো। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের এক বইয়ে ১২, ৮০০ ধানের তালিকা আছে। আর জার্মপাজমে রক্ষিত আছে কম বেশি হাজার পাঁচেক দেশি জাতের ধান। স্মৃতি হাতড়ে বের করলাম রাজবাড়ি-কুষ্টিয়ার ভাগে এই ধানের নাম আছে। এবং এখন পর্যন্ড় জাতটিও টিকে আছে, অন্ড়ত জার্মপাজম সেন্টারে। আমার মনে হলো, এটাতো আউশ ধানের জাত। ডাঙায় বোনা হয়। ডাঙাতেই ভালো হয়। অতএব খরায় ভালো হবে, মায়ের এই দাবি সত্যি না হয়ে পারে না। এখন আমার কাজ তা পরখ করে দেখা। অন্ড়ত নড়ই ধানে না হোক, এর আশে পাশে আরও যে ধানের লিস্টি আছে যেমন হনুমান জটা, পরাঙ্গী, কাইশাপাঞ্জা, ধারিয়াল, পানবিড়া অথবা আরও অন্য কোনো জাত থেকে। নিশ্চয়ই খুঁজে পাবো খরায় টিকে থাকা গুণাগুণ। এখন বিশ্ব ব্যাপী পানির খুবই টানাটানি। আমাদের দরকার এমন একটি ধান যা খরা সহ্য করতে পারে। এই যে খুঁজে ফেরার প্রেরণা আমাকে সাহস যোগালো, তা আর কিছু না সাধারণ এমন হাজার মায়েদের হাত ঘুরে আসা লোক-বিজ্ঞানের ফসল। এমনি আরও কত লোক-বিজ্ঞান আমাদের চার

পাশ জুড়ে আছে। মরিচ গাছের পাতা কুঁকড়ে যাচ্ছে, ছাই দেও। নারকেল গাছে ফল ধরছে না, কিছুটা জায়গা চৌক করে গর্ত করে দেও। আউশ ধানের জমির জাওলা (ধানের চারা) পাতলা দেখাচ্ছে, মই দিয়ে গোড়া থেঁতলে দেও। এগুলো নিছক কোনো গাঁজাখুরি নয়। সাধারণ মানুষদের হাজার বছরের গবেষণার ফলাফল এগুলো। এগুলো পরিষ্কার বিজ্ঞান। মরিচের পাতা কুঁকড়ে যাওয়া ভাইরাসের কারণে হতে পারে। ভাইরাসের বাহক হলো পোকা। ছাই দিলে পোকা আসবে না। । নারকেলের গাছে অতিরিক্ত জোর (বেশি করে নাইট্রোজেন গ্রহণের ফলে excess vegetative growth হলে) গাছে ফল কম ধরতে পারে। কারণ গাছের কার্বন-নাইট্রোজেন অনুপাত ভারসাম্যহীন হয়ে যায়। গাছের গায়ে চৌক গর্ত করে দিলে মাটি থেকে নাইট্রোজেন টেনে তুলায় ভাটা পড়ে। ফলে কার্বন-নাইট্রোজেন অনুপাত ব্যালেন্স হওয়ায় গাছে ফল ধরে। একইভাবে মইয়ের চাপে ধানের চারার গোড়া থেঁতলে যাওয়ায় বিশেষ হরমোনের প্রভাবে বেশি করে কুশি গজায়। ফলে জাওলা পাতলা হলেও বেশি কুশি হওয়ায় জমিতে অনেকটা ভারসাম্য ফিরে আসে। এমন অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। এগুলো সাধারণ মানুষের আবিষ্কার। অনেক আগের এক বিজ্ঞানী (অঙ্ক, কৃষি প্রকৃতি বিজ্ঞানে বিশারদ) লীলাবতী এমনি অজস্র লোকবিজ্ঞানকে পর্যবেক্ষণ করে আমাদের জন্য সংগ্রহ করে রেখে গেছেন। হয়তো তিনি নিজেও অনেক গবেষণা করেছেন। এগুলোই এখন ”খনার বচন” বলে আমাদের কাছে পরিচিত।

এই লোক বিজ্ঞান গবেষণার শুর"টা কিন্তু আমাদের সভ্যতার সমান সমান বা তার চেয়েই কিছুটা প্রাচীন। আজ আমাদের চার পাশে যে অসংখ্য ফল-ফসল ও অষুধি গাছ-গাছালির ছড়াছড়ি দেখতে পাই তার অধিকাংশই কিন্তু এই অবস্থায় ছিল না। এগুলো বুনো পর্যায় থেকে মানুষের গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে আসতে সময় লেগেছে অনেক। কেবল সম্ভব হয়েছে আদি কালের কিছু মানুষের অসম্ভব ধীশক্তির কারণে। বলা হয়ে থাকে আদি যুগের মানুষেরা প্রায় ১৫০০ প্রজাতির খাদ্য ও অষুধি গাছের কথা জানতেন। জানতেন প্রায় ৫০০ প্রজাতির শাক-সবজির কথা। মানুষের এই লোকবিজ্ঞানের ধারা কিন্তু এখনও চলছে। এবং তা কখনও একলা কখনও বা আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। আগের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (IRRI) ৯০ শতাংশ প্রযুক্তি এসেছে এশিয় চাষীদের কাছ থেকে। এবং এদের বাহক ছিলেন এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে আসা বিজ্ঞানীরা। এই বিজ্ঞানীরা চিন্ত্র-চেতনায় তাঁদের নিজস্ব লোকবিজ্ঞানকে ধারন করেছিলেন বলেই এমনটি সম্ভব হয়েছে। তাঁরা তাঁদের সাথে নেওয়া লোক-প্রযুক্তিকে নিয়ে আরও গবেষণা করেছেন এবং ক্ষেত্র বিশেষে পরিমার্জন পরিবর্ধন করেছেন। পরে তা আবার চাষীদের কাছেই ফিরিয়ে দিয়েছেন। এমনকি আই আর ৮ নামের যে অলৌকিক ধান সারা পৃথিবীর ধান উৎপাদন ও গবেষণায় বিপ্লব এনেছিল তার মূলেও কিন্তু লোক-বিজ্ঞানী বা চাষিদের অবদান আছে। এর পিতৃ-মাতৃ সারি ছিল দি-জিউ- উ-জেন এবং পেটা জাতের সংকর। এই দুটো জাতের কোনো একটির সাথে আবার ভারতবর্ষের (বাংলাদেশেরও) লতি শাইলের কৌলিতাত্ত্বিক যোগাযোগ আছে বলে শুনেছি। যাহোক এগুলো এশিয়ার বিভিন্ন চাষিদের হাত ঘুরে IRRI ’র বিজ্ঞানীদের হাতে পড়ে।

কৃষি এবং লোক-বিজ্ঞানের সম্পর্ক নিয়ে আরও কিছু কথা বলা যায়। ধান কেটে নিলে অবশিষ্ট নাড়ার গোড়া থেকে কুশি গজায় আমরা সবাই জানি। এই কুশিকে মুড়ি, ডেমি বা Ratoon বলে। অনেকে বুদ্ধি করে এই ডেমিকে যত্ন-আত্তি করে কিছু ফসল ঘরে তুলার চেষ্টা করে থাকেন। ধানের ডেমি নিয়ে আমেরিকা থেকে শুর" করে পৃথিবীর নানা দেশে গবেষণা হয়েছে। ব্রি'র ফামিং সিস্টেমের বিভাগীয় প্রধান ড. কুদ্দুস IRRI ’তে তাঁর মাস্টার্সের থিসিস করেছিলেন বেশ আগে। মাত্র কয়েক বছর আগে

বোরো মৌসুমে আলোক-সংবেদী জাতের ডেমি উৎপাদন ক্ষমতা নিয়ে ব্রি-বরিশাল কেন্দ্রের ড. বিলাশ চন্দ্র রায় বেশ কিছু কাজ করেছিলেন। কিন্তু বোরোর পর আমন ধান হিসেবে ডেমির যুতসই প্রয়োগের সীমাবদ্ধতার কারণে এই গবেষণা আর এগিয়ে যেতে পারেনি। তবে এই পদ্ধতিকে অনেক আগে থেকেই একটি সম্ভাবনাময় প্রযুক্তি হিসেবে চিন্তা করা হতো। এ কারণেই এই পদ্ধতির সম্ভাবনা যাচাইয়ের জন্য ভারতের বাঙ্গালরুতে গত শতকের আশির দশকের শেষ দিকে একটি ওয়ার্কশপ হয়। সেখানে উপস্থাপিত পেপারগুলোতে সম্ভাবনার পাশাপাশি ভালোমন্দ অনেক কিছু উঠে আসে। যেমন কেবলমাত্র উঁচু জমিতেই ডেমি করা সম্ভব। ডেমি রোগবালাই ও পোকামাকড়ের পোষক হিসেবে কাজ করতে পারে। ফলে পরবর্তী ফসলের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে। দুই ফসলের মাঝে জমির বিশ্রামের সুযোগ থাকে না। ইত্যাদি ইত্যাদি। অতএব সম্ভাবনা থাকলেও এটাকে খুব একটা এগিয়ে নেয়া সম্ভব হচ্ছিলো না। ব্যাপারটা অনেক বিজ্ঞানীর জন্য মাথাব্যাথার কারণ ছিল। IRRI 'র একজন গবেষণা সহকারী মি. ক্যালেন্ডাসিয়ন সহজ সরল এই প্রযুক্তিটির মাঠে মারা যাওয়ার বিষয়টি মেনে নিতে পারছিলেন না। তারঁ মাথায় বিষয়টি সব সময় ঘুরপাক খেত। তিনি একবার গ্রামে গিয়ে একটা ধানের জমি দেখে আঁতকে উঠেন। (ফিলিপিনো চাষিরা ধান কাটে অনেক খানি নাড়া রেখে।) পাশাপাশি দু'সারি নাড়া কেউ যেন সুন্দর করে বেনি (Braided) ভাঙিয়ে রেখেছে। দেখতে আকর্ষণীয় হলেও এটা কিন্তু সাধারণের কাছে কোনো বিষয় না। এভাবে বেনি ভাঙানো নাড়ার গোড়া থেকে শক্ত সামর্থ্য ডেমি বের হয়েছে যা সাধারণ লিকলিকে ডেমি থেকে একেবারেই ভিন্ন। ক্যালেন্ডাসিয়নের কাছে বিষয়টা অভিনব মনে হলো। তিনি খোঁজ নিয়ে জানলেন ঐ বেনি ভাঙানো কারো কোনো পরিকল্পিত কিছু ছিল না। নেহায়েৎ জমির পাশের বাড়ির এক মেয়ের খেয়ালি শিল্পকর্ম ছিল সেটা। বাচ্চা মেয়ের নিজের মাথায় লম্বা চুল না থাকায় ধানের নাড়াকে সে চুলের বেনিতে রূপান্তরিত করেছে। ক্যালেন্ডাসিয়নের বস ছিল ড. গ্যারিটি, IRRI 'র Multiple cropping division এর বিজ্ঞানী। পরে তারা এক সাথে কয়েক বছর ধরে এই নিয়ে গবেষণা করেন। তাঁরা এই পদ্ধতিকে লক-লজিং (Lock lodging) পদ্ধতি বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। এই পদ্ধতিতে কেন ভালো ডেমি হচ্ছে সে কারণও তাঁরা বের করলেন। তাঁরা দেখলেন গোড়া থেঁতলে যাওয়ার কারণে নাড়ার একেবারে গোড়া থেকে শক্ত-সামর্থ্য ডেমি বের হয়। আর সাধারণ অবস্থায় ডেমি হয় নাড়ার উপরের দিকে। ফলে এই ডেমিগুলো হয় লিকলিকে এবং দুর্বল। কিছু কৃষিতাত্ত্বিক বিষয়ও বের করার চেষ্টা করলেন যাতে করে লক-লজিং এর ডেমিগুলো আরও ভালো হয়। তারা হাত দিয়ে বেনি বানানোর পরিবর্তে প্রকৌশলীদের দিয়ে যন্ত্র পর্যন্ত বানিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁদের গবেষণা কর্ম আমার সরাসরি দেখা হয়নি। তবে IRRI ' তে থাকার সুবাদে ক্যালেন্ডাসিয়নের সাথে আমার এই বিষয়ে কথা হয়েছে। তাঁর সেমিনারে আমার থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। লক-লজিং কার্যক্রমের স্লাইডগুলো আমি দেখেছি। প্রধান ফসলের পর লক-লজিং করে আরেকটি ফসল ঘরে আনতে ৭৫ দিন সময় লেগেছিল বলে আমার মনে পড়ে। আর ফলন, প্রধান ফসলের কাছাকাছি ছিল। ব্যাপারটা আমাকে ভীষণভাবে উদ্দিপ্ত করে। আমার এক সহপাঠিকে (বর্তমানে পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের টাণ্ডুজাম কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয়ের কৃষিতত্ত্ব বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. ফতেচাঁদ ওড) তার পি-এইচ. ডি গবেষণা কাজের জন্য বিষয়টিকে বেছে নিতে বলি। ফতে সেই মতো কাজ করে। তার পি-এইচ. ডি'র বিষয় ছিল এই প্রযুক্তির উন্নয়ন। ফলাফল ছিল আশাপ্রদ। কিন্তু তার কাজের দৌড় ছিল থিসিস পর্যন্ত। পাকিস্তানে ধানের কদর গমের মতো না। সেকারণেই হয়তো এ কাজে পরে সে আর আগ্রহ পায়নি।

আমি যতই বলি আসলে কি ডেমি তথা লক-লজিং প্রযুক্তির সাথে লোক বিজ্ঞানের কোনো সম্পর্ক আছে? লক-লজিং এর জন্ম বিবরণ থেকে তো মনে হয় আছে। কারণ খেয়ালি মেয়ের সেই সাধারণ ঘটনা থেকে

একটা অসাধারণ ঘটনার জন্ম হলো। মনে হতে পারে হঠাৎ কিছু একটা হয়ে গেল। হতে পারে। কিন্তু ক্যালেন্ডাসিয়নতো এশিয় বিজ্ঞানীদের একজন যারা নিজেদের লোক-বিজ্ঞানকে সর্বসাধারণের করার তাগিদে IRRI ' তে মিলিত হয়েছিলেন। আর পৃথিবীতে আচমকা আবিষ্কারেরও অনেক ঘটনা আমরা জানি। পেনিসিলিন আবিষ্কারের ঘটনা এদের মধ্যে একটি। মেয়েদের হাতে কৃষিবিজ্ঞান আবিষ্কারের ঘটনাটাও আচমকা ছাড়া কিছু না।

দুঃখের বিষয় পরবর্তীতে ডেমির মতই লক-লজিং এর ভাগ্য একই পরিণতি বরণ করে বলে মনে হয়। ড. গ্যারিটি একসময় IRRI ' ছেড়ে চলে যান। মি. ক্যালেন্ডাসিয়ন একা এইপ্রযুক্তি নিয়ে আর এগুতে পেরেছিলেন বলে শুনিনি। আমার ইচ্ছে ছিল এই বিষয় নিয়ে কিছু কাজ করার। কিন্তু আমার তখনকার কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি বুঝাতে পারিনি। এরপর ব্রি'র আঞ্চলিক কার্যালয় হবিগঞ্জে গিয়ে কিছু একটা করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু বেরোর পরে বন্যার পানি চলে আসায় পরীক্ষাটি শেষ করা যায়নি। আর হবিগঞ্জে বছরে মাত্র একটি ফসলই করা যায়। তাই ডেমি নিয়ে গবেষণার সুযোগ কোথায়?

লোক-বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ২০০৭ এ বাংলাদেশের হাওর এলাকাসহ আগাম লাগানো অনেক এলাকার বোরোধান ঠান্ডায় আক্রান্ড় হয়ে চিটা হয়ে যায়। সে সময় হাওড় এলাকায় দেখেছিলাম চিটা ধানের জমিতে গরু চরতে। ঢাকার রূপগঞ্জ এলাকায়ও এমনিভাবে ধান চিটায় আক্রান্ড় হয়। সেখানে অনেক চাষিকে দেখেছিলাম কিছুটা নাড়া রেখে ধানের গাছ কেটে ফেলছে। অর্থাৎ ডেমির প্রস্তুতি চলছে। জাতটা ছিল ব্রি ধান২৮। আমি জানতাম এই জাতের ডেমি তৈরির উপযোগিতা যথেষ্ট। ঐসব চাষির উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারিনি। তবে পরবর্ত?তে আর খবর নেওয়া হয়নি। তবে তাদের জমিতে ভালো ডেমি হওয়ার কথা। যদি জমিতে পানি না এসে থাকে তবে অবশ্যই তারা কিছু ফলন পেয়ে থাকতে পারেন।

ডেমি নিয়ে কিছু একটা হতে পারে তা আর কোনোদিন ভাবতে চাইনি। কিন্তু তার ব্যতয় ঘটলো সাম্প্রতিক একটা সাফল্যগাথা পত্রিকায় দেখে। আর-ডি-আর-এস এর জনাব মৃন্ময় গুহ নিয়োগী (এম জি নিয়োগী) এর নায়ক। তার কাজের ভঙ্গীটা একটু ভিন্নধর্মী তা আমি জানতাম। মঙ্গা প্রশমনের জন্য ব্রি ধান৩৩ নিয়ে প্রথম তিনিই মাঠে নেমেছিলেন। সেটা ২০০৩ এর কথা। IRRI ' র প্রতিনিধি ড. জয়নাল আবেদীন তার স্বাক্ষী। ব্রি'রংপুরের ড. মজিদও সাথে ছিলেন। কিন্তু নিয়োগীর এই প্রথম ভূমিকা কারও মনে আছে কিনা কে জানে? তিনি আবার ডেমি ধানের পরিবর্তিত প্রযুক্তি নিয়ে মাঠে নেমেছেন। তার কোনো ল্যাবরেটরি নেই। কোনো ল্যাব টেকনিসিয়ান নেই। মাঠই তার ল্যাব, চাষিরাই তার ''কুশি প্রযুক্তির কুশিলব। তার এ প্রযুক্তি বোরো এবং আমনের মাঝের সময়টা কাজে লাগানোর প্রযুক্তি। গরীব চাষী বোরোধান ঘরে ধরে রাখতে পারে না। উঠতে উঠতেই বেচা-বন্টন শেষ। আবার আমন আসতেও বেশ দেরি। মাঝে মঙ্গার ধাক্কা। তাই বোরোর কুশি দিয়ে অল্প সময়ে কিছু ধান তো আগাম ঘরে তুলা যায়। পরে আবার একটু দেরি হলেও ব্রি ধান৪৬ বা ব্রি ধান৩৩ লাগিয়ে সময়টাকে কভার করে আমন ফসলও ঘরে তুলা সম্ভব। নিয়োগীর বর্তমান কার্যক্রম; লোক বিজ্ঞান নিয়ে IRRI ' র প্রথম দিককার বিজ্ঞানীদের করা কাজের সাথে মিল আছে দেখা যায়। এটা সাধারণ মানুষের জানা প্রযুক্তি। কিন্তু নিয়োগী যেটা করেছে তাহলো পরিমার্জন পরিবর্ধন করে যাদের প্রযুক্তি তাদের কাছেই আবার ফিরিয়ে দিয়েছে। যাহোক একাজেও ঝুঁকি আছে। বোরো হিসাবে নিয়োগী হাইব্রিড ধান ব্যবহার করেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ড় হাইব্রিড শুধুমাত্র অনুকূল পরিবেশের জন্য উপযুক্ত। হাইব্রিডের রোগবালাই সহনশীল জাত মাঠ পর্যায়ে নেই। তাই পরিচর্যার ব্যাপারে আরও কিছু কাজ করার দরকার আছে বলে মনে হয়। তবে

নিয়োগী সাবধানতার কথাও বলেছেন। কুশির জমি রোগালাইয়ের পোষকভূমি হিসেবে কাজ করতে পারে। তাই প্রথম বছর এই পদ্ধতিতে চাষ করার পর পরের বছর ফসলক্রমে পরিবর্তন আনার কথা বলেছেন। আমি মনে করি এখনই তার পরিতৃপ্তির ঢেকুর তুলার সময় না। এই প্রযুক্তি নিয়ে আরও অনেক কিছু ভাববার আছে। এই পদ্ধতিতে এক জায়গার কুশি আরেক জায়গা লাগানো হয়। যেহেতু ফসলের জন্য সময় কম, তাই কুশিগুলো একটু সুস্থ সবল হলে ভালো হয়। লক লজিং পদ্ধতিতে সুস্থ্য সবল কুশি বানানো সম্ভব। এজন্য হয়তো কিছুটা উপর থেকে ধান কেটে জমিতে বেনি তৈরি করে রাখা যেতে পারে। বেনি বানানোর সময় খেয়োল রাখতে হবে যেন ধান গাছের গোড়াগুলো কিছুটা দুমড়ে-মুচড়ে যায়। তাহলেই যথেষ্ট পরিমাণ ভালো চারা পাওয়া সম্ভব। আমার বিশ্বাস জনাব নিয়োগী তার পরের যাত্রা এভাবেই শুরু করবেন।

আরও যে বিষয়গুলো বিবেচনায় আনা দরকার তাহলো ফসলক্রমের অবস্থা। বোরো-রোপা আমন ফসলক্রমের তুলনায় পরিবর্তিত ফসলক্রম হবে বোরো-কুশি-নাবি রোপা আমন। পরিবর্তিত এই ফসলক্রম পরিবেশ, মাটির স্বাস্থ্য এবং অর্থনৈতিকভাবে কতখানি মানানসই তাও খতিয়ে দেখার দরকার। অবশ্য নিয়োগী বলছেন বেশ মানানসই। কিন্তু অন্যদেরকেও তা বলতে হবে। প্রত্যেক চাষিরা এক একজন উঁচুমাপের মাইক্রো ইকোনোমিস্ট। বলা যায় লোক বিজ্ঞানের সূত্র ধরেই তারা এটা কয়েক বছরে যাচাই বাছাই করে নিতে পারবে।

‡Mvevj Iqvwgs Ges Rwj Avgb avb

†m†Þ¤i 13, 2008, ˆ˜wbK msev˜

দক্ষিণ এশিয়ায় জলবায়ু পরিবর্তন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়াম হয়ে গেল ঢাকায়। গ্লোবাল ওয়ার্মিং সংক্রান্ত Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) এর যে অনুভব তা এই সিম্পেজিয়ামে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। IPCC ধারনা আগামী ১০০ বছরে প্রথিবীর তাপমাত্রা বাড়বে ১.৮ থেকে ৪.০ ডিগ্রী সে। বাড়তি তাপে ভারসাম্যহীন ভাবে বরফ গলতে থাকবে। ফলে সাগর-পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাবে বেশ। IPCC 'র হিসাব মতে এই পরিমাণ ০.২৬ থেকে ০.৫৯ মিটার (পরিমাপ পদ্ধতির ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া একই ধরনের উপাত্তের মধ্যে কিছুটা হের-ফের থাকতে পারে)। ফলে বাংলাদেশের মত সাগর সমতল দেশসমূহের বিস্তর জায়গা (এখনকার হিসেবে প্রায় ২০ শতাংশ!) পানির নিচে ডুবে যাবে। এই ডুবে যাওয়ার পুরোভাগে থাকার কথা দেশের সবগুলো বন্যাপ্রবণ এলাকা। হয়তো হাওড়গুলো স্থায়ী জলাধারে রূপ নেবে। এই স্থায়ী জলাধারগুলোর কিনার ঘেঁষে যা কিছু ডাঙা জায়গা থাকবে সেখানটায় বন্যা হওয়ার প্রকৃতি আজ থেকে ভিন্নতর হওয়ার কথা। তবে এই ভিন্নতর হওয়াটা কেমন হবে সে ব্যাপারে বাইরের বিজ্ঞানীরা কিছু বলছেন না। আমাদের বিজ্ঞানীরাও এখন পর্যন্ত আলাদা করে কিছু ভাবছেন বলে সিম্পোজিয়াম দেখে মনে হয়নি।

কিয়োতো প্রটোকল অনুযায়ী গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমন নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে নামিয়ে আনার কথা বলা হয়েছে। এখানে মন্দের ভালো হিসেবে বেস লাইন বছর ধরা হয়েছে ১৯৯০। গ্যাসের নির্গমন, প্রটোকল অনুযায়ী ১৯৯০ সালের থেকে আর যেন বেশি না হয়। অথচ এই গ্যাসগুলো যদি আজই কোনো যাদুবলে বন্ধ করে দেওয়া যায় তবুও কয়েক শতাব্দী ধরে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এবং সাগরপৃষ্টের উচ্চতা বাড়ার প্রক্রিয়া চলতে থাকবে। গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গমন শূন্যের কোঠায় আনা আকাশ কুসুম মাত্র। সবাই কিয়োতো প্রটোকল মেনে চললেও এই গ্যাস কিছু না কিছু বাড়তেই থাকবে। এর অর্থতো এই দাঁড়ায় যে আমরা অনিবার্যভাবেই পানিতে ডুবতে থাকবো। বিপুল এই জনসংখ্যার দেশে এখনই আমরা প্রচণ্ড ভূমিসংকটে ভুগছি। যখন সত্যি দেশের বিরাট অংশ ডুবে যাবে তখন কী হবে অবস্থা? ঐ এলাকার সমস্ত মানুষগুলোকে সরে যেতে হবে। কিন্তু কোথায় যাবে তারা? এতদিন শুধু রাজনৈতিক কারণেই এধরনের সমস্যা হয়েছে বলে জানি। তাই এক দেশের উদ্বাস্তু

প্রতিবেশী দেশে কিছুদিন থাকার পরে আবার নিজের ভিটেয় ফিরে আসার ভরসা থাকে। কিন্তু গে্লাবাল ওয়ার্মিংএর কারণে উদ্ভূত উদ্বাস্তুদের নিজের ভিটের অস্তিত্ব থাকার সম্ভাবনা কম। অনেকটা নদী-ভাঙা মানুষের মতো। তাই দেশের ভিতরেই ভাসমান হয়ে থাকতে হবে। ফলে ভয়ানক উদ্বাস্তু বিপর্যয় দেখা দেওয়ার সম্ভবনা।

সাগর ফুলে ওঠার আরও অনেক অর্থ আছে। সাগরের লবণ পানি দেশের অনেক ভিতরে চলে আসবে। ফলে দক্ষিণের জৈব প্রতিবেশে আমূল পরিবর্তন আসা স্বাভাবিক। কৃষি ব্যবস্থাপনায়ও বিরাট পরিবর্তন আসতে বাধ্য। বাস্তুচ্যুত বিরাট জনগোষ্ঠীর পেশায় পরিবর্তন আসতে পারে। তাদেরকে হয়তো মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করতে হতে পারে। এই বিষয়ে সংশি্লষ্ট বিজ্ঞানীরা উপায় বের করবেন নিশ্চয়ই। জলাধারের কিনার ঘেঁষে বন্যা-প্রবণ বিরাট এলাকায় গতানুগতিক মওসুমি ফসলের জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়ার সম্ভাবনা কম। খুব সম্ভব স্বল্পকালীন সবজির চাষ, সরজান-ভিত্তিক সবজির চাষ, সবজির ভাসমান বাগান ইত্যাদির প্রচলন হয়ে যাবে। তবে এই পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার জন্য আমাদের প্রধান ফসল ধানের কোনো জুড়ি নেই। সত্যিকথা বলতে কি পৃথিবীতে ধানই একমাত্র ফসল যার ভিতর পরিবেশভেদে মানিয়ে নেওয়ার অদ্ভুৎসব কলা-কৌশল লক্ষ্য করা গেছে। ধান জলীয় পরিবেশ থেকে উদ্ভূত। অথচ দেশি আউশ ধান শুধুমাত্র বৃষ্টি নির্ভর পরিবেশ যেখানে পানি দাঁড়ায় না সেখানে দিব্যি মানিয়ে নিয়েছে। আবার পানি দাঁড়ানো বা সেচ দেওয়া অবস্থায় শাইল ধান এবং বোরো ধান ভালো হয়। জলি আমন ধান শুকনো জায়গায় বুনলেও বর্ষায় পানি আসার সাথে সাথে লম্বা হতে থাকে। সৃষ্ট জলাধারে ধানের চাষ করা যাবে না সত্যি। কিন্তু ডুবে যাওয়া পরিবেশের চারপাশ দিয়ে সফল কৃষির জন্য একসময় জলি আমন নিয়ে ভাবতে হবে।

বন্যাপ্রবণ বাংলাদেশের একসময়ের প্রধান ফসল ছিল এই জলি ধান। উফশী বোরোর প্রতাপে জলি আমনের বর্তমান অবস্থান শোচনীয় বলা যায়। তবুও কিছু কিছু পকেট এলাকা যেখানে সেচ নেই, সেচের ব্যবস্থা করা মুস্কিল, অথচ বানের পানি আসে, মুখ্যকোনো রবি ফসলের সুযোগ সীমিত এমন পরিবেশে এখনও এই ধানের চাষ হয়। কিছু জায়গা আছে বোরো ফসল কেটে নেওয়ার পর বানের পানি একটু দেরি করে আসার অবসরে হালকা কাদাকরা জমিতে বুনে দেওয়া হয়। যেভাবেই করা হোক না কেন এক সময়ের প্রধান এই ফসলের বর্তমান এরিয়া কভারেজ মাত্র ৫০-৬০ হাজার হেক্টর। অথচ এই জাতের প্রকৃতি দেখে মনে হয় এটা আমাদের পরিবেশের জন্যই তৈরি হওয়া। কিন্তু ফলন কম। অথচ আমাদের এখনকার চাওয়া বেশি ফলন। জলি আমনের পোড়া কপাল বলতে হয়। ১৯১৭ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত একটাও উফশী জাত বের করা যায়নি। এখানে গবেষকদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। কারণ তাদের চেষ্টার কমতি ছিল না। এই জাতের ধানের শারীরতাত্ত্বিক প্রপঞ্চসমূহ এমনিযে, পানি বাড়ার সাথে সাথে সে লম্বা হতে পারে ঠিকই। কিন্তু লম্বা হওয়ার কারণে তার বাড়তি ফলনের জন্য যে শক্তি দরকার সেটা আর থাকে না। আধুনিক জাতের ধানে খড় ও ধানের পরিমাণ একসাথে হেক্টরে যদি ১০ টন হয় তাহলে মোটামুটি ৫টন হবে ধান আর ৫ টন হবে খড়। কিন্তু জলি আমনের বেলায় খড় ধান দিয়ে আধুনিক জাতের সমান হলেও অর্থাৎ ১০ টন হলেও পরিণতিতে ৮ টন হবে খড়, ২ টন হবে ধান।

জলি আমন নিয়ে প্রথাগত গবেষণার শুরু ১৯৩৪ থেকে। সারা পৃথিবীর মধ্যে জলি আমনের জন্য প্রথম গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয় তৎকালীন আসাম প্রদেশের সিলেট জেলার হবিগঞ্জে। সীমিত সুযোগ কাজে লাগিয়ে তখনকার গুটিকয় বিজ্ঞানীর সাফল্য ছিল ঈর্ষনীয়। এঁদের মধ্যে সাক্কাতুল মজিদ, পরেশমোহন গাঙ্গুলি, জিতেন্দ্রলাল সেন, এঁদের নাম চলে আসে সবার আগে। তাঁদের সময়ে জলি আমন নিয়ে যতটুকু করার তা তাঁরা করেছিলেন। তাঁরা জলি আমনের চার শতাধিক জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করে গবেষণা শুরু করেন। এই গবেষণার ভিত্তিতে তাবদ্ জলি আমনকে বৈশিষ্ট্য অনুসারে ২৬ টি গ্রুপে ভাগ করেন। গ্রুপের প্রধান জাতের নাম অনুসারে গ্রুপগুলোর নামকরণ করা হয়। আজকের প্রজন্মের কৃষক ও কৃষি বিজ্ঞানীদের কাছে নামগুলো অদ্ভূত মনে হতে পারে। তবুও নামগুলো এখানে তুলে ধরলাম। যেমন: ভাদৈয়া, আশ্বিনা, বামৈয়া, বাগদার, ফুলকুঁড়ি, খামা, লাকি, বাজাইল, করকতি, বিরইন, কালিমেকরি, জোয়ালভাঙা, বাদল, বাগু আমন, পঙ্খিরাজ, গুয়াই, ধলা আমন, লাল আমন, কালা আমন, মাটিয়া আমন, পরচুন, তিল বাদাম, মুরাইল, গুটক, লারা আমন, এবং চাপলাশ। এগুলোর অধিকাংশই ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা থেকে সংগৃহীত। ১৯১৭ সালের ঢাকা ফার্মে নিচু জলাভূমি (এখন যেখানে ক্রিসেন্ট লেক এবং সংসদ ভবনের অবস্থান) তে পদ্মা বিধৌত এলাকার জলি আমন নিয়ে কিছু কাজ হয়। বাইশ বিশ, গাবুরা, লক্ষ্মীদিঘা, হিজল দিঘা, সোনা দিঘা, বড়ন ইত্যাদি নামের দু-একটা জাত এখনও হয়তো পাবনা-ফরিদপুরের কোথায়ও কোথায়ও খুঁজে পাওয়া যাবে। সে আমলের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বেশ কিছু জাত হবিগঞ্জ থেকে অবমুক্ত করা হয়। তার মধ্যে হবিগঞ্জ আমন ২, ৪, ৬ যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। সে সময়ের তুলনায় আজকের বিজ্ঞানীরা জলি আমন ধানের তেমন কোনো সাফল্য তুলে ধরতে পারেননি। বলা যায় বিজ্ঞানীরা কিছুটা হতাশ। আমাদের

দেশের যে জলি আমন ধান যা প্রয়োজনে ধীরে-ধীরে বাড়তে থাকা পানিতে তিন-চার মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। এই ধরনের ধানের উপজাত কেবল মাত্র আমাদের ও আশেপারে গুটিকয় দেশেই পাওয়া যায়। আসাম এবং পশ্চিম বাংলার কিছু জায়গা ছাড়া গভীর পানির ধান এতটা পানি ভাঙতে পারে বলে জানা নেই। অন্যান্য দেশের পরিবেশের জন্য এমনটি দরকারও নেই। শুধুমাত্র আমাদের দেশের সীমিত পরিমাণ এলাকার জন্য এমন ধরনের ধানের প্রয়োজন হয়। এই সীমিত পরিবেশের সাম্প্রতিক বন্যা পরিস্থিতি কোনো প্রকার আঙ্কিক মডেল মেনে চলে বলে মনে হয় না। একারণেই বোধ হয় আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রকৃত গভীর পানির ধান নিয়ে আর কিছু করার চিন্তা-ভাবনা করছে না। ফলে জলি আমন ধান গবেষণা-পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনতে হয়েছে। এখনকার গবেষণা স্ট্রাটেজি হলো এক মিটারের চেয়ে নিচের পানিতে ভালো ফলন দেয় এমন ধানই তৈরি করতে হবে। কিন্তু আমরা যখন কথা বলছি গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে তখন এই স্ট্রাটেজি কতখানি কার্যকর তা কিন্তু ভাবনার বিষয়। কারণ গ্লোবাল ওয়ার্মিংএর প্রতিফল দেখা দেবে আজ থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর পরে। তখন বোরো আবাদের জন্য হাওড় এলাকার বেশির ভাগ জায়গা অনুপযুক্ত হয়ে পড়তে পারে। এই সমস্ত এলাকায় যেখানে বোরো রোপণ করা সম্ভব সেখানেও বোরোর জন্য নির্ধারিত সময় কমে যেতে পারে। যাহোক বোরোর অবস্থা যাই হোক না কেন ডুবে যাওয়া আবাদ যোগ্য জমির জন্য জলি আমন একটা পরিবেশ-বান্ধব বিকল্প ভাবনা হতে পারে তা আগেই বলেছি। এজন্য আমাদের এমন জাতের জলি আমন ধান দরকার যেগুলো-

- সহসা বেড়ে যাওয়া পানির নিচে তলিয়ে গেলেও ১০-১২ দিন বেঁচে থাকতে পারে।
- ৩-৪ মিটার পানি ভাঙতে পারে।
- জলাবদ্ধ পরিবেশে স্বাভাবিক বাড়-বাড়তি চালিয়ে নিতে পারে।

কোনো কোনো জাতের মধ্যে প্রয়োজনীয় আরও কিছু গুণাবলী থাকা দরকার। যেমন: যেমন চাষ করা হবে বোরো ধান হিসেবে। কিন্তু কেটে নেওয়ার পর কুশি থেকে আবার যে গাছ হবে তা যেন পানির সাথে বেড়ে উঠার ক্ষমতা রাখে। সর্বোপরি অবশ্যই উচ্চ ফলনশীল হতে হবে।

এখন কথা হলো এতযে গুণের সমাহার একটা জাতের মধ্যে সম্ভব কিনা! আজকাল জৈব-প্রযুক্তি বা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং যেভাবে এগুচ্ছে তাতে মনে হয় সম্ভব। ধানের ব্যাপারে এই প্রযুক্তির সাম্প্রতিক কিছু অগ্রগতি বেশ আশাপ্রদ। লবণসহনশীল উন্নত জাত আমাদের হাতে আছে। ভবিষ্যতে আরও বেশি করে লবণ সহ্য করতে পারে এমন জাত আমরা পাবো। জলমগ্নতা (Submergence) সহনশীল জাত এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। বিজ্ঞানীরা এই কাজের জন্য আগেই নির্দিষ্ট ক্রমোজমে প্রযোজ্য গুণাবলীসমূহের জন্য দায়ী জিন বা জিনসমষ্টি (Quantitative trait loci) সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। সেগুলোকে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে প্রচলিত কিছু ভালো জাতের মধ্যে প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে বা হচ্ছে। এ ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা সার্থকই বলা যায়। তাই ভবিষ্যতের জলি আমনের বেলায় যে সার্থকতা আসবে না এমনটি বলা যায় না। এখন যা দরকার তাহলো, ধানের সমস্ত জার্মপ্লাজম খুঁজে উচ্চ ফলনশীলতার জন্য দায়ী জিন বা জিন সমষ্টিকে সনাক্ত করা। পরে নিশ্চয়ই সুযোগ করে ভবিষ্যতের একটা আমনের জাত অবশ্যই বের করা যাবে।

এজন্য আমাদের সংশ্লিষ্ট গবেষণা অবকাঠামোকে শক্তিশালী করা দরকার। গবেষণার সুযোগ-সুবিধা কি আছে সেটা বড় কথা না; বড় কথা হলো এই পথে আমাদের পা বাড়ানোর দরকার আছে কিনা সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া। বর্তমানে জলি আমন ধান গবেষণায় বেশ খানিকটা স্থবিরতা বিরাজ করছে। এর কারণগুলো আগে বলা হয়েছে। কিছু কিছু বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্তহীনতাও এর জন্য কম দায়ী নয়। অনেকেই বলে থাকেন জলি আমন নিয়ে গবেষণা করা সময়সাপেক্ষ এবং ঝুঁকিপূর্ণ। একবছর গবেষণা করে যে ফলাফল আসে পরের বছর সেই ফলাফল একই ধরনের না হওয়ার সম্ভাবনা। আমরা অনেক সময়ই নিজেদের সমস্যা নিজেরা বুঝতে চেষ্টা করি না। এবং অন্যের চাপিয়ে দেওয়া পথে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করি। এখন গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর তোড়জোড় চলছে। সতর্ক না হলে এর চরম প্রতিফল একদিন আসবেই। কৃষির ব্যাপারে আমাদের মতো করে সমস্যা সমাধানের জন্য দরকার পরিবর্তিত পরিবেশে অভিযোজনক্ষম কৃষিব্যবস্থাপনা তথা উফশী জলি আমন ধান দরকার । আমাদের দেশে সাধারণ ধান নিয়ে গবেষণার শুরু ১৯০৫ সালে। এর প্রায় ৬০ বছর পর আমরা অলৌকিক ধান আই আর-৮ এর সন্ধান পাই। এরপর আরও অনেক প্রকারের ধান আবিষ্কার করা গেছে। তখন জেনেটিক ইঞ্জিয়ারিং প্রযুক্তি ছিল না। এখন এই প্রযুক্তি আছে। তাই নির্দিষ্ট সময়ের আগেই আমরা আমাদের চাহিদা মোতাবেক একটা জলি আমনের জাত বের করতে পারবো বলে আশা করা যায়। এজন্য চাই সদিচ্ছা। বিজ্ঞানীরা বলছেন প্রশমন এবং অভিযোজন, এই দুই প্রপঞ্চ দিয়ে গ্লোবাল ওয়ার্মিং মোকাবিলা করা সম্ভব। এখানে বিজ্ঞানী এবং নীতি-

নির্ধারক দুজনের ভূমিকা সমান সমান। দুজনকেই তাদের ভূমিকার রাখার তাগিদে এগিয়ে আসতে হবে। এবং তা সময় থাকতেই। এই মূহুর্তে আমাদের হয়তো জলি আমনের দরকার নেই। তাই বলে এই মাটি থেকে উদ্ভূত একটি উপজাত বিদায় নেবে তাতো ঠিক না। বরং এটাকে নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাওয়া উচিৎ। তাহলে সময়ে এই জাত থেকে আমরা ঠিকই উপকার ভাবো। এজন্য পরিবেশে এবং চাহিদাকে সামনে রেখে আমাদেরকে স্বপ্নদ্রষ্টা ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হতে হবে। ভারতের সাবেক প্রেসিডেন্ট বিজ্ঞানী এ পি জে কালামের স্বপ্নদেখার কথা দিয়ে শেষ করছি। চাঁদের বুকে আবাস গড়ে তুলার স্বপ্নে বিভোর এক দল মানুষ একটা রিয়েল এস্টেট ব্যবসা খুলে বসেছেন। অনেকেই সেখানে প□ট পাওয়ার জন্য চেষ্টা করছেন। ড. কালামও এই কাতারে আছেন। আর যাই হোক বিজ্ঞানী কালামের এই স্বপ্নকে আমরা খাটো ভাবে নিতে পারি না। তিনি নিশ্চয়ই জানেন চাঁদে আপাতত কেউ বাড়িঘর বানাবে না। কিন্তু বসতি গড়ার যে স্বপ্ন তাতো সবাইকে ভালো পথেরই সন্ধান দেবে। আমরাও এভাবে স্বপ্ন দেখতে চাই। সংশি□ষ্ট এ্যারিনার বাইরের লোকদের কাছে জলি আমন কথাটা বেমানান এবং সামান্য বলে মনে হতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতের বিপর্যস্থ কৃষি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য পরিবেশ বান্ধব এই প্রযুক্তিটির উন্নয়ন করা একান্ড়ভাবেই জর"রী। এজন্য আমাদের স্বপ্নদ্রষ্টা কালামের মতো কাউকে দরকার।

nvBweW avb Ges c‡qvRbxq wKQ K_v

†m‡Þ¤^i 20, 2008, ˜wbK msev˜

কোনো এক পত্রিকায় আবারও খবর হয়েছে-হাইব্রিড ধান। কুষ্টিয়ার মীরপুর ও ভেড়ামারায় বেশকিছু কৃষকের জমিতে হাইব্রিড ধান ফুলে বের হতে পারে নাই (প্রকৃত পক্ষে আংশিক বের হয়েছে)। আউশের জন্য নির্দিষ্ট কোনো হাইব্রিড ধান এখন পর্যন্ড় নেই। তবু চাষিরা হাইব্রিড ধানের আবাদ করেছে আউশ মৌসুমে। তারা বলছে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ থেকে তাদেরকে বলা হয়েছে করতে। হাইব্রিড বীজ নিজের জমিতে আপাতত তৈরি করা যায় না। বাজার থেকে কিনতে হয়। চাষীরা তাই করেছে। তাদের ভাষায় তারা কৃষি বিভাগের পরামর্শ মোতাবেক ডিলারের কাছ থেকে এই বীজ সংগ্রহ করেছে। অতএব নিশ্চয়ই কোনো কোম্পানির ব্যানারে তা বাজারে চালু ছিল। ধরে নেওয়া যায় কোম্পানির কর্তা ব্যাক্তিরা এর পিছনে আছে। আছে জাঁদরেল সব পরামর্শকবৃন্দও। এই সমস্ড় কোম্পানিতে এখন যারা পরামর্শকের আসনে আসীন তাদের অনেকেই এক সময় কৃষি-সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কোনো শীর্ষ পদে ছিল। এইসব শীর্ষব্যাক্তিরা তাদের আগের ইমেজ দিয়ে সাবেক সহকর্মীরেকে মোটিভেট করার চেষ্টা করে থাকে। হয়তো এ কারণেই ঐ এলাকায় সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ-পর্যায়ের কর্মকর্তাদেরকে অনুরোধে ঢেঁকি গিলতে হয়েছে। তারা চাষিদেরকে বোরোর হাইব্রিড আউশে করতে বলেছে। গতানুগতিক একটা ধারনা ছিল যে, যে ধান বোরোতে হয় তা অবশ্যই আউশেও হবে। এখন দেখা যাক পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই সমস্ড় কর্তাব্যক্তিদের চিন্ড়-চেতনা কতখানি টেকসই।

গত শতকের ষাটের দশকের মাঝামাঝি আন্ড়র্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রথম উচ্চ ফলনশীল ধান আই আর-৮ আবিষ্কার করে। খাটো জাতের এই ধানকে অলৌকিক ধান বলে অভিহিত করা হয়। সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে সে ধান। কিন্তু সেটা ছিল সাময়িক প্রয়োজন মেটানোর তাগিদ। আই আর-৮ ভালো ফলন দেয়। অতএব এই ধানের চাষ করলে

সারা পৃথিবীর ঐ সময়ের চালের অভাব মিটে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। কারণ শুধুতো গাছ না, উৎপাদনের জন্য এর আশেপাশের জৈব এবং অজৈব সমস্ত পরিবেশকে হিসেবে আনতে হয়। তাই নির্দিষ্ট পরিবিশের জন্য উদ্ভাবিত এই ধান বেশিদিন তার উপযোগিতা ধরে রাখতে পারেনি। পরিবর্তিত পরিবেশের উপযোগী আলাদা আলাদা ধানের জাত দরকার। বিজ্ঞানীরা জানতেন কৃষি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এমনটিই হয়। পৃথিবী ব্যাপী ধান গবেষণায় এক নতুন জোয়ারের অপেক্ষায় তারা ছিল। তাই আই আর-৮ কে পাদপীঠে রেখে পৃথিবীর সবগুলো ধান উৎপাদনকারী দেশ তাদের নিজেদের পরিবেশ অনুযায়ী আলাদা আলাদা জাত বের করতে থাকে।

আমাদের দেশের কথাই ধরা যাক। আমাদের প্রথম উদ্ভাবিত জাত বিআর১। যার আদুরে নাম চন্দিনা। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) তখনকার উদ্ভাবিত অনেকগুলো কৌলিক সারির মধ্যে এই জাত নির্বাচনে স্থানীয় চাষীদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। এখন যেটা Farmers' participatory approach বলে পরিচিত ব্রিতে তা অনেক আগেই চালু হয়ে গেছে। এই জাত বোরো এবং আউশের জন্য অনুমোদিত হয়। তারপর বিআর২ বা মালা। প্রখ্যাত ধানবিজ্ঞানী ড. শাহ্ মোহাম্মদ হাছানুজ্জামানের মতে মালা হলো প্রাকৃতিক হাইব্রিড। এরপরের জাতটি বিআর৩ বা বিপ্লব। আমাদের জন্য এজাতটি সত্যি এক বিপ্লব ঘটাতে সক্ষম হয়। কারণ, এটা ছিল আউশ আমন বোরো এই তিন মৌসুমের জন্যই উপযুক্ত। কিন্তু টুংরো রোগ-কাতর হয়ে পড়ায় এই জাতটি দৃশ্যপট থেকে অনেক দূরে সরে যায় এই ধান। এরপরের জাত বিআর৪; বিআর৫ শুধুমাত্র রোপা আমন মৌসুমের জন্য অবমুক্ত করা হয়। তবে বিআর৬ থেকে পরের দিকের বেশ কিছু জাত (বিআর ১০ এবং ১১ বাদ দিয়ে) বোরো এবং আউশ মৌসুমের জন্য নির্ধারিত হয়। তারপরে আসে পরিবর্তন। বিজ্ঞানীরা আউশ এবং আমনের ঋতুগত পার্থক্য বিবেচনায় আনেন। বোরো অপেক্ষাকৃত অনুকূল পরিবেশের সময়। পক্ষান্তরে আউশ মৌসুমে তাপমাত্রা বেশি। আকাশও মেঘলা থাকে। সাথে আর্দ্রতা বেশি হওয়ায় রোগবালাইয়ের আক্রমণ বেশি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তাই এই দুই মৌসুমের জন্য আলাদা জাতের ধানের দরকার। বিআর২৬ শুধুমাত্র আউশের জন্য অনুমেদিত। ব্রিধান ২৮ এবং ব্রিধান ২৯ শুধুমাত্র বোরো মৌসুমের জন্য আবাদ করতে বলা হয়। এরপরের জাতগুলো সম্পূর্ণভাবে মৌসুম ভিত্তিক। বিআর২৬ যে বোরোতে করা যায় না তা নয়। একই ভাবে ব্রিধান ২৮ এবং ব্রিধান ২৯ আউশে করলে খারাপ হবে তা নয়। প্রকৃত পক্ষে এই দুটো জাত শুধু বোরোতে নয় অনেক জায়গায় আউশ এবং আমনে করারও নজির আছে। তারপরও যদি কিছু ঘটে যায় তখন দায়ী হবে কে? নজির আছে। আউশে বেশি বেশি রোগ বালাইয়ের শিকার হয় ব্রিধান ২৮ এবং ব্রিধান ২৯। আমনেও নিশ্চয়ই এমন কোনো অসুবিধা হয়ে থাকতে পারে। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরই বিজ্ঞানীর এই জাতগুলোকে নির্দিষ্ট মৌসুমের জন্য বেঁধে দিয়েছেন।

আবার হাইব্রিডের কথায় আসি। গতানুগতিক চিন্তা ধারায় যারা বোরোর জন্য উপযোগী কোনো জাতকে আউশের জন্য চাষ করতে বললেন তারা এবার ভেবে দেখতে পারেন গলদটা কোথায়। যারা এখনও এভাবে উপদেশ দিচ্ছেন তারা তাদের নলেজ-গ্যাপটা (knowledge gap) পূরণ করে নিতে পারেন। আর গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে সবাই যেখানে চিন্তিত সেখানে কোনোপ্রকার ঢালাও সিদ্ধান্ত দেওয়ার দিন শেষ।

এবছর (২০০৮) নিবিঢ় বোরো উৎপাদন কর্মসূচিতে হাইব্রিডের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। অনিবার্য কারণেই বাইরে থেকে বীজ আমদানি করতে হয়। আমদানি প্রক্রিয়া সময় সাপেক্ষ। বীজ আনা হবে, তারপর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে তা বিতরণ করা হবে। সময়মত চাষিদের কাছে তা পৌঁছাবে কিনা এ নিয়ে সে সময় সংশি্লষ্ট মহল খুবই দুঃশ্চিন্ড়ায় ছিল। মাঠপর্যায়ের কৃষিবিদরা আরও বেশি করে দুশ্চিন্ড়্রয় ছিল যে, দেরিতে লাগানো হাইব্রিড আদৌ হবে কিনা। এব্যাপারে ব্রি'ও কিছুটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ছিল বলা যায়। কারণ আমদানীকরা হাইব্রিড আমাদের পরিবেশে এবং দেরিতে আবাদ করায় কেমন হবে তাতো তাৎক্ষণিক ভাবে জানার কোনো উপায় নেই। যদিও উপর মহল থেকে বলা হয়েছিল এগুলো আমাদের পরিচিত হাইব্রিড। শুধুমাত্র বীজ আনা হলো বেশি করে। এখানে একটা কথা বলার প্রয়োজন বোধ করছি যে, চিনা বীজ-ব্যবসায়ীরা বোধ হয় দূরদর্শী। তা নাহলে সিডরের মত দুর্যোগের পর আমাদের যে বিপুল পরিমাণ হাইব্রিড ধানের বীজ দরকার ছিল তা তারা সহসাই যোগান দিল কী করে? গণচিন দেশ হিসেবে বিরাট হতে পারে, কিন্তু "চাহিবা মাত্র ইহার গাহেককে" এই বিপুল পরিমাণ বীজ সরবরাহ করা চারটি খানি কথা নয়। আর দুর্যোগের এই বীজের চালান ভিক্ষার চালের মতন। ভালো-মন্দ যাচাই করার সুযোগ কম। সেখানে শুধু বীজই নয় বীজের সাথে রকমারী রোগবালাইও চলে আসা বিচিত্র না। আমাদের ভাগ্য বলতে হয়। বোরোতে সমস্যা হতে হতেও হয়নি। কিন্তু তাই বলে যে পরবর্তীতে সমস্যা হবে না তাতো কেউ বলতে পারে না। এই যেমন কুষ্টিয়াতে হলো। চাষিরা এখন দুর্দশাগ্রস্থ। তারা ক্ষতিপূরণ চেয়ে বসতে পারেন। স্থানীয় কৃষিকর্মকর্তারাও ফাঁপড়ে আছেন বলা যায়। কারণ বোরোর হাইব্রিড আউশে করলে এমন বিপদ ডেকে আনবে তা তারা আগে ভাবতে পারেননি। এসম্পর্কে কোনোপ্রকার তথ্যও তাদের হাতে সরবরাহ করা হয়নি। কারণ যারা বীজ দিয়েছেন তাদের কাছে এধরনের কোনো পরীক্ষালব্ধ তথ্য ছিল না। অগতির গতি ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট। ধান গবেষণায় এরকম তথ্য না থাকাই স্বাভাবিক। কারণ এই ধান, ধান গবেষণার হাত দিয়ে আসেনি। তবে কেন ফুলে পুরোপুরি বের হতে পারলো না তার সুরাহা হওয়া দরকার। কারণ এই ধান নিয়ে ভবিষ্যতে এমন বিপদে আর যেন কাউকে না পড়তে হয়। অন্ড়ত মারা যাওয়ার পর সন্তুষ্টিজনক একটা পোস্ট-মোর্টেম রিপোর্টতো চাই। কৃষিবিদদেরই কেউ কেউ বলছেন গাছ টুংরো আক্রান্ড় ছিল। হতে পারে। ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মাঠে এবারের আউশে করা হাইব্রিডের পরীক্ষা কার্যক্রমে টুংরোর উপদ্রব ছিল বেজায় রকমের। অর্থাৎ আউশে হাইব্রিড এখনও যারপর নাই দুর্বল। আবার কেউ কেই বলছেন অদ্ভুত কথা: বীজে দোষ ছিল। বীজ নাকি তার প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা পায় নাই। তিনি বোধ হয় বীজের বাসন্ড়ীকরণের (vernalization) কথা বলতে চাইছেন। নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় গমের বীজকে Incubate করলে গমের জীবনকাল কমে আসে। শীতের দেশে শীত বাঁচাতে এই পদ্ধতি চালু আছে। আমাদের দেশে ধানের জীবনকাল কমাতে এক সময় এই পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করা হয়। দেখা গেছে ৩২° সে তাপ মাত্রায় যদি ধান গজানো যায় তবে ধানের জীবনকাল ১০-১৫ দিন কমে আসে। এই গবেষণা বহু বছর আগের। প্রযুক্তিটা ভালো কিন্তু আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে অচল। কারণ চাষীরা ৩২° সে তাপমাত্রা কিভাবে বজায় রাখবে। এতবছর পর হাইব্রিডের দোষ ধরতে গিয়ে বীজের উপর তাপমাত্রার প্রভাব আবারও নলেজ গ্যাপের কথা মনে করিয়ে দেয়। আমি যতদুর বুঝি এখানে তাপমাত্রাকে বদনামের ভাগী করার একেবারেই সুযোগ নেই। কারণ বীজ থেকে চারা গজালো, মাঠে লাগানো হলো এবং গাছ হলো।

অবশেষে ফুল বের হলো না বা পুরোপুরি বের হলো না। ধরে নিলাম এই হাইব্রিড ধানের মধ্যে চিনের ঠান্ডা এলাকার ধানের জিনের অস্তিত্ব থাকতে পারে। ফলে যথাযথ তাপমাত্রার অভাবে জীবনকালের উপর প্রভাব পড়তে পারে। কিন্তু ফুলে বের হবে না এমনতো হতে পারে না।

যাহোক দুটো কারণে ধানগাছে "ফুল বের হওয়" বাধাগ্রস্থ হতে পারে। এক: জাত যদি আলোক-সংবেদী হয় তবে দিনের দৈর্ঘ কমবেশি ১০ ঘণ্টায় না আসা পর্যন্ত ফুলে বের হবে না। আরেক অবস্থা হলো যদি কোনোপ্রকার পীড়ণ-পরিস্থিতি যেমন খরা বা অতিরিক্ত শীতের মধ্যে পড়ে যায় তাহলে শিষ বের হতে পারবে না বা হতে গেলেও গলায় আটকে থাকবে। কোনো একটি প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদানের মারাত্মক অভাব হলেও (পুষ্টি-পীড়ণ) গাছের বাড়-বাড়তি কমে গিয়ে এমনটি হতে পারে। তো আমার মনে হয় খরা ছাড়া এক্ষেত্রে অন্যকোনো পরিস্থিতির সম্ভাবনা কম। তবে খরা পরিস্থিতিও মারাত্মক আকার নিতে পারে বলে মনে হয় না। অবশ্য অনেকে টুংরো আক্রান্তের কথা বলেছেন তা আগেই বলেছি। এ রোগের বেলায় শিষ বের হওয়া ব্যহত হয়। যদি খোল পোড়া, খোলপচা জাতীয় বা এধরনের কোনো রোগে আক্রান্ত হয় তাহলেও শিষ বেরোনো আধাগ্রস্থ হতে পারে। এধরনের আমদানিকরা জাতগুলোর রোগবালাইয়ের ব্যাপারে খুব একটা নজরদারি করার সুযোগ থাকে না। তাই রোগবালাই হতে পারে। ধান গবেষণার হাইব্রিড গবেষণা মাঠ যেহেতু টুংরোর প্রকোপ ছিল তাই বলা যায় ওখানেও টুংরো হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তবে ফুল যে একবারে বের হতে পারেনি তা সত্যি না। বের হয়েছে আংশিক। কৃষিকর্মকর্তারা ক্রপকাট (Crop cut) করেছে। ফলন আশানুরূপ হয়নি। যা কিছু পাওয়া গেছে তা হাইব্রিডের জন্য বেমানান। আরেকটা সম্ভাবনার কথা অব-দ্য-রেকর্ড বলতে হয়। হাইব্রিড মানে নির্বাচিত পিতৃ-মাতৃ সারির প্রথম প্রজন্মের বীজ। আধুনিক প্রজননবিদ্যার পিতা বলে অভিহিত গ্রেগর জোহান মেন্ডেলের মতে প্রথম প্রজন্মের সবগুলো গাছ একই রকম হওয়ার কথা। হাইব্রিডের ফলন ভালো দেখে অনেক চাষিরা পরের বছরের জন্য বীজ সংগ্রহ করে রাখতে পারে। হয়তো বোরোতে বীজ রেখে আউশে আবাদ করলো। অতি উৎসাহী চাষিদের বেলায় অনেক সময় এমনটি ঘটতে পারে। এখানেও নলেজ গ্যাপের বিষযটা এসে যায়। এধরনের বীজ ব্যবহার করলে ফসল হবে গাই-বাছুরে। গাছ ছোট বড় হবে। সমান ভাবে ফুলবে না। কখন ফুল আসছে, কখন পাকছে, ঠাহর করা মুস্কিল। ফলনও হবে নামমাত্র। বড় কোনো বীজ কোম্পানির ছত্রছায়ায় এমনটি হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় শূন্য। কিন্তু তৃণমূল পর্যায়ে এমন হলে ঠিকানো দায়।

যাহোক এমন হবে তা বলছি না। ধরে নিচ্ছি রোগই হয়েছিল। মাঠে যারা আছেন তাদেরকে এ ব্যাপারে প্রস্তুত থাকার দরকার ছিল। কারণ হিতে বিপরীত হলে জবাবতো তাদেরকেই দিতে হয়। এখানে রোগীর জীবনকাল মাত্র কয়েকমাস। এবং তার কথা বলার ক্ষমতা নেই। তাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার মত যন্ত্রপাতি বা আনুষঙ্গীক ব্যবস্থাও মাঠ পর্যায়ে নেই। অতএব তারা যা করতে পারতেন তাহলো বীজের সাথে সাথেই সতর্কতামূলক কিছু পরামর্শ পত্র বিতরণ। অবশ্য এজন্যতো দরকার পরীক্ষালব্ধ কিছু ফলাফল। সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কাছে তা ছিল কিনা চিন্তার বিষয়। সংশিষ্ট বীজ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান যদি বলে থাকেন যে তারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেই বাজারে বীজ ছেড়েছেন তাহলে আমি বলবো তারা তা

যথাযথভাবে করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এবং হওয়ারই কথা। কারণ বেসরকারি পর্যায়ে কৃষি গবেষণার আবশ্যকীয় পরিকাঠামো এখনও গড়ে উঠেনি। সবচেয়ে বড়কথা হলো এজন্য যে দক্ষ মানবসম্পদ দরকার তা এখনও তাদের হাতে নেই।

হাইব্রিড ধান নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে অনেক কথা হয়েছে। আসলে হাইব্রিড প্রযুক্তি একটি আধুনিক বিজ্ঞান। হাইব্রিড ধান সাধারণ উফশী ধানের চেয়ে ১৫-২০ শতাংশ বেশি ফলন দেয়। যে দেশে এত ভাতের দরকার সে দেশের জন্য এই ধান চাষের তো কোনো বিকল্পই থাকার কথা না। তাই যারা দেশের তড়িৎ ভাতের অভাব মেটাতে চান তারাতো হাইব্রিডের কথা বলবেনই। সোজা হিসাব; চলতি আধুনিক জাতের ফলন যদি হেক্টরে পাঁচ টন হয় তবে উপযুক্ত পরিবেশে হাইব্রিড হবে প্রায় ছয় টন। সারা দেশের ১০ মিলিয়ন হেক্টর ধানীজমির পুরোটাতে হাইব্রিড করতে পারলে নীট ১০ মিলিয়ন টন ধানের উৎপাদন বেশি হবে। তবে অসুবিধা হলো এই দর্শনটার বানিজ্যিক ব্যবহার হচ্ছে। মূল গ্রাহকতো সাধারণ চাষিরা। তাদেরকে সহজেই হাত করা যায়। তাই শুরুর থেকেই হাইব্রিড ধানের কারবারীরা ভালো আছে বেশ। কিছু কিছু এনজিও এর থেকে বাদ যায় না। হাইব্রিডের ভালোমানুষির আড়ালে রাস্তায় এদের বিজ্ঞাপন দেখা যায়, High-brid ধানের চাষ করুন। High-brid আর Hybrid (প্রকৃত অর্থে যা হওয়া উচিৎ) এক কথা নয়। High-brid বলে কোনো জাত বা শব্দ নেই। অথচ এভাবেই যদি সাধারণ কোনো জাতকে হাইব্রিডের মোড়কে সাধারণ চাষিকে গছিয়ে দেওয়া হয়! একবারতো ধোঁকা দেওয়া তেমন কোনো কঠিন কাজ না। আমরা জানিনে; প্রতারনার আরও অনেক কৌশল থাকতে পারে। তবে নামী-দামী কোম্পানি বা সবাই এপথে পা বাড়ায় তা কেউ বলছে না। ভুক্তভুগীমাত্র জানেন এ ব্যবসা একমুখী। এখানে কেনা মাল ফেরৎ দেওয়ার সুযোগ নেই। বীজের ব্যাপারে আমরা অতটা আইন সচেতনও না যে কোর্টকাচারি করে কিছু একটা ফায়দা উঠানো যেতে পারে।

সত্যিকথা বলতে কি হাইব্রিড ধানের দেশিয় প্রযুক্তি এখনও শক্ত আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। যতদিন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট একটা ভালোমানের হাইব্রিড না দিতে পারছে ততদিন এই অবস্থার উন্নতি দেখছি না। বিভিন্ন কোম্পানি যে হাইব্রিডের প্রচলন করছে, তার অধিকাংশই চিন থেকে আমদানি করা। অনেক ক্ষেত্রে চিনা বিজ্ঞানীরা সরাসরি তাদের সাথে কাজ করে থাকে। ফলে আমাদের মত করে এখনও একটা হাইব্রিড আমরা পাইনি। এছাড়া লাগসই একটা হাইব্রিড বের করা সহজ কথা না। আজ পর্যন্ত ব্রি একটি মাত্র হাইব্রিড বের করতে পেরেছে। ব্রি হাইব্রিডধান১। শুধুমাত্র দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের জন্য এই ধান আবাদের অনুমোদন দেওয়া হয়। ফলন ভালই বলা যায়। কিন্তু জীবনকাল বেশি হওয়ায় এই জাতটি জনপ্রিয়তা পায়নি। তবে ব্রি'র কম-জীবনকাল বিশিষ্ট হেক্টরে সাড়ে আট টন ফলন দিতে পারে এমন হাইব্রিড (আনুষঙ্গীক প্রযুক্তির মোড়কে) তাড়াতাড়িই চাষিদের কাছে আসছে। এখন কেবল সরকারি অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। আমার বিশ্বাস চাষীরা এবার নিজেদের মত করে একটা হাইব্রিড ধান পাচ্ছে। এব্যাপারে ব্রি চাইলে বি এ ডি সি বা দেশপ্রেমী কোনো বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সময়ে বীজ উৎপাদনের ব্যাপারে পরষ্পরকে সাহায্য করতে পারে।

দেশের হাইব্রিডের ধানের বীজ কোম্পানিগুলো সরাসরি চিনের হাইব্রিড গবেষণারকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত। সরকারের সাথে তাদের চুক্তি ছিল নিজের দেশে তাদেরকে বীজ উৎপাদন করতে হবে। এব্যাপারে তাদের বর্তমান অগ্রগতি সুস্পষ্ট নয়। স্বল্প পরিসরে হলেও তাদের কিছু গবেষণা কর্মকাণ্ড থাকতে পারে। কিন্তু সরকারী গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে তাদের কতখানি জ্ঞানের ভাগাভাগী হচ্ছে সেটাই প্রশ্ন। তা যদি হতো তাহলে আউশে হাইব্রিড করা নিয়ে এহেন বিপত্তি ঘটতো না। যাহোক এই পরিস্থিতিকে সতর্কসংকেত বলেই মনে করা ভালো। আরেকটা কথা বলা দরকার, কোনো জাত ছাড় পাওয়ার আগে ধান গবেষণার কয়েকশ' বিজ্ঞানী সেটা নিয়ে নানামুখি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থাকে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান পক্ষ থেকে ছাড় করার আগে হাইব্রিডের বেলায়ও এধরনের পুঙ্খানুপঙ্খ গবেষণা হওয়ার দরকার। অন্যথায় বড় ধরনের কোনো বিপর্যয়ের মুখোমুখি হওয়া লাগতে পারে।

অসময়ের বানভাসি এবং কৃষি পুনর্বাসন

†mtÞ¤i 23, 2008, ˜'bK mgKvj

ভেবেছিলাম এবারের বানভাসিটা বোধ হয় আর হবে না। কিন্তু আমার বোধটা মিথ্যে প্রমাণীত হলো। বান ভাসি হলো। পদ্মা যমুনা এমনকি আজকের দিনের নিরীহ গড়াই-মধুমতিও ভাঙছে। আমরা খবর পেলাম চাষিদের আমন প্রস্তুতির বিরাট ক্ষতি হয়ে গেছে। বীজ তলা ডুবে গেছে। লাগানো আমন ডুবে গিয়ে নষ্ট হয়ে গেছে। যেখানে পাট কেটে পাটের জমিতে আমন লাগনো হয় তাদের লাগানো ধানও ডুবে গেছে। আর ফরিদপুর-রাজবাড়ির চাষিরা যে জমিতে পাট থাকতেই গজানো ধান বুনে নতুন এক শস্যধারা চালু করেছিলেন সেগুলোও মার খেয়েছে শুনেছি। উত্তর বঙ্গের নানা জায়গায় একই ভাবে ধানের জমি ডুবে গেছে।

আগেও বানভাসি হতো। তবে বিরতি দিয়ে হতো মনে হয়। খনার বচনে এমন ইঙ্গিত আছে। সেই যে, 'আমে ধান, তেঁতুলে বান'। অর্থাৎ যে বছর তেঁতুল বেশি হবে সেবছরই শুধু বান হবে। অথবা 'চাঁদের শোভার মধ্যে তারা, বর্ষে পানি মুষল ধারা'। চাঁদের শোভার মধ্যে তারা দেখা গেলেই অবিরাম বৃষ্টি হবে এবং বানভাসির সম্ভাবনা। এখন ফি বছর বানভাসি হচ্ছে। এই বানভাসিটা এখন অকালেই বেশি হচ্ছে। হয় এখানে না হয় না হয় সেখানে। বাঙালি জীবনে অকাল বোধন যেমন কালের হয়ে গেছে, অকাল বন্যাও তেমনই স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়ার সময় এখন। কারণ গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর যুগ। এমন আরও অনেক বৈপরীত্যের মুখোমুখি হতে হবে আমাদের।

পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে জমি তৈরির জন্য বেশি সময় দেওয়া যাবে না। আগাছা পচানোর সময় নেই। তাই আগাছা হাত দিয়েই ভালো করে বেছে ফেলতে হবে। এই সময়েই প্রয়োজনীয় পটাশ, ফসফেট এবং আরও যদি কোনো সার দরকার হয় জমিতে দিয়ে দিতে হবে। সার নির্বাচন জমির পরিস্থিতি বুঝে করতে হবে। জমিতে ফসল বেশি দিন থাকার সুযোগ নেই বিধায় এক্ষেত্রে ইউরিয়া একবারে দিয়ে দেওয়া ভালো। সেটা হওয়া উচিৎ বুনার ২০-২৫ দিন পর। আবহাওয়া অনুকূল না হলে ইউরিয়া কিছু বিরতিতে উপরি প্রয়োগ করা যেতে পারে। তাহলে এই সারের কার্যকারিতা বাড়বে।

যাহোক এই অবস্থায় চাষিদের কী করার থাকতে পারে? নাইজার শাইল, বিআর২২ কিংবা বিআর২৩ দেরি করে লাগানোর জন্য সবচেয়ে ভালো। এই কাতারের সাম্প্রতিক সংযোজন ব্রি ধান৪৬। কিন্তু এগুলোর বীজতলা ডুবে গেছে। তবে সরকারি

হস্তক্ষেপে নিরাপদ জায়গায় যদি কিছু বীজ তলা করা থাকে তাহলে ভালো। এগুলো গুছিতে বেশি করে চারা দিয়ে নতুন করে লাগানো যেতে পারে। তবে গুছিতে বেশি করে লাগানোর মতো যথেষ্ট চারা পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। এক্ষেত্রে বিকল্প পদ্ধতি হলো বীজ বুনে দেওয়া। কাদাজমি সমান করে নিতে হবে। তারপর সরাসরি বীজ ছিটিয়ে বুনা যেতে পারে। ছিটিয়ে বুনার আগে বীজ সামান্য গজানো হলে ভালো হয়। বীজ বুনার সময়ে ড্রাম সীডার ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এই ক্ষেত্রে হাত দিয়ে সজোরে ছিটিয়ে বুনলে বীজটা মাটির কিছুটা ভিতরে ঢুকে যাবে। (তবে সেক্ষেত্রে কাদা থকথকে হওয়া দরকার)। ফলে গাছ মাটিতে শক্ত ভাবে দাঁড়াতে পারবে। পরে যদি নিম্ন চাপের কারণে ঝড়-বাদল হয় তাহলে গাছ উপড়ে যাবে না বা পাকা ধান শুয়ে পড়বে না। বুনার সময় দেখে নিতে হবে আকাশ ভালো আছে কিনা। বুনার পর জমিতে পানি জমলে ধানের বীজ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই জমির পানি নিকাশের ব্যবস্থা থাকতে হবে। দেরিতে ফসল প্রতিষ্ঠার জন্য স্বল্প জীবনকালীন জাত হলে ভালো হয়। এজন্য ব্রি ধান৩৩ একটা পছন্দের জাত হতে পারে। বিআর১ এবং বিআর২১ আশ্বিনের মাঝামাঝি পর্যন্ত বুনা যায়। তবে ৩০ ভাদ্রের মধ্যে বুনতে পারলে বেশি ভালো। ভাদ্র মাসের মধ্যে বোনার জন্য আরও যে জাত দুটো মোটামুটি ভালো তাহলো বিআর১২ এবং বিআর১৪। বিআর১১ একটা ভালো অপশন হতে পারে। এই জাতের কিছুটা আলোকসংবেদনশীলতা আছে। অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে দেখা গেছে এটা কাদার মধ্যে বুনে দিলে ভালো ভাবে গজাতে পারে।

চারা পওয়া সাপেক্ষে ধান লাগাতে পারলে কিছুটা সময় সাশ্রয় করা যায়। ব্রি ধান৪৬ যদি কেউ ৩০ ভাদ্রের মধ্যে এক মাসের চারা দিয়ে রোপণ করতে পারেন তবে ভালো ফলন পাওয়া যাবে। তবে বিআর২২ বিআর২৩ এর বেলায় দেখা গেছে ১৫ আশ্বিন পর্যন্ত একটু বেশি বয়সের চারা গুছিতে বেশি করে লাগালে কিছু ফলন পাওয়া যায়। বিআর২২ নিয়ে আমার ব্যক্তিগত কিছু অভিজ্ঞতা মাঠপর্যায়ের কৃষিবিদদের সাথে ভাগাভাগী করতে পারি। ব্রি-গাজীপুরে করা এক পরীক্ষায় ২১ আশ্বিনে ৩০ দিনের চারা লাগিয়ে বিঘায় ১২ মণ ফলন পাওয়া গেছে। ভাদ্রের শেষ দিনে বা পয়লা আশ্বিনে লাগিয়ে আমাদের ফলন ছিল বিঘায় ১৬ মণের মত। হিসেব করে দেখা গেছে প্রতি এক দিন দেরি করে লাগানোর জন্য বিঘায় ৬ কেজি করে ফলন কম হয়।

মোটামুটি ভাদ্রের ৩০ তারিখের মধ্যে ফসল প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি সারতে পারলে ভালো। আলোক-সংবেদী জাত যেমন বিআর২২, বিআর২৩ বা ব্রি ধান৪৬ অগ্রাণের মাঝামাঝি নাগাদ ফুলে বেরিয়ে যেতে পারে। এরপরই তো বেশি করে ঠান্ডা পড়া শুরু করে। এ সময় দিনের তাপমাত্রা একটু বেশি থাকলে এই জাতগুলোর তেমন অসুবিধা হওয়ার কথা না। কিন্তু অন্য জাতগুলো ঠান্ডায় ভীষণ কাতর। ফলে এমন পরিস্থিতিতে শিষ নাও বের হতে পারে। যাহোক এসময় বৃষ্টির অভাব হতে পারে। এজন্য সুযোগ মতো একটা সেচের ব্যবস্থা করতে পারলে ভালো। ফুল বের হওয়ার সময় যদি একটু বেশি ঠান্ডা পাচ্ছে বলে মনে হয় তবে জমিতে কয়েক ইঞ্চি পানি ধরে রাখা উচিৎ। ফলে পানির কারণে জমিতে একটু গরম আবহাওয়া বজায় থাকবে। ফলে ধান সহজে ফুলে বের হতে পারবে।

যদি রোপা আমন প্রতিষ্ঠার কোনো সুযোগ না থাকে তাহলে যেন উপর মহল থেকে আমন নির্ভর কোনো কর্মসূচি চাপিয়ে না দেওয়া হয়। বিকল্প হিসেবে এখনই রবি ফসলের পরিকল্পনা করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে সরকারের বিশেষ কর্মসূচি থাকতে পারে। কোনো এলাকার চাষিরা কোনো রবি ফসলে যদি অভ্যস্ত না হয় তবে তাদেরকে বিকল্প ফসল চাষে বিশেষভাবে সাহায্য করা যেতে পারে। কারণ রবি ফসল ধানের চেয়ে সাশ্রয়ী এবং পরিবেশ বান্ধব। এজন্য জায়গাভেদে ডাল,তেল আলু এবং গম, ভুট্টার, মিস্টি আলু এবং শাক-সবজির চিন্তা করা উচিৎ। সরকার বিভিন্ন সময়ে শস্য বহুমুখীকরণের চেষ্টা করেছেন। খাদ্যাভাস পরিবর্তনের কথা বলেছেন। তাদেরকে দিয়ে এই কর্মসূচিটা ঝালিয়ে নেওয়া যেতে পারে। এ ব্যাপারে একটা কথা না বললে নয়। আমাদের উপর মহল থেকে সব সময় ধানের আবাদ বাড়ানোর উপর জোর দেওয়া হয়। যা নেহায়েৎ অবৈজ্ঞানিক। এব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিৎ শুধুমাত্র ধানের জমিতে ধান সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। রবি-বোরো বা শুধুমাত্র বোরো ফসলক্রম যাই অনুসরণ করা হোক না কেন এগুলোর জন্য যা জরুরী তাহলো চাষিদের জন্য সময়মত ইনপুট সরবরাহ করা। সঠিক সময়ে সঠিক জাত সরবরাহ নিশ্চিত করা, প্রয়োজনে ঋণের ব্যবস্থা করা, শস্যবীমা চালু করা, ফসলের বাজার নিশ্চিত করা, ভর্তুকী দেওয়া সহ বহু উপায়েই কৃষি পুনর্বাসন করা যেতে পারে। এটা অবশ্যই হতে হবে দীর্ঘ মেয়াদি, এলাকা ভিত্তিক এবং বিশেষজ্ঞদের দিয়ে করানো পরিকল্পনা মোতাবেক। এটা যে শুধুমাত্র ধান দিয়েই করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। গেল বারেও তো নাবি বন্যায় আমন ফসল তার প্রতিষ্ঠাকালে মার খায়। ধান পাকার সময় সিডরে মার খায়। তারপরও পরবর্তী রবি মৌসুমে কৃষিবিভাগ যেন ধান নিয়েই ব্যস্ত ছিল বেশি। কোনো সন্দেহ নেই ধান, আমাদের প্রধান ফসল। ধানের উপর জোর থাকতে হবে। সাথে অন্যান্য ফসলের দিকেও নজর দিতে হবে। আমাদেরকে এখন থেকেই ব্যালেন্সড কৃষির কথা ভাবতে হবে। এজন্য যা দরকার তাহলো সরকার ও

চাষিদের নিয়ে যথাযথ লাগসই পরিকল্পনার। পরিশেষে, কথাটা কার ঠিক মনে নেই; যতীন্দ্র মোহন বাগচীর কিনা! অন্ধ বধু ননদিনীর হাত ধরে নদীর ঘাটে যাচ্ছে। পায়ের নিচে কিছু একটা ঠেকতেই আঁৎকে উঠলোঃ লো ঠাকুরঝি! পায়ের নিচে নরম ঠেকলো কি? আসলে ওটা যে ফুল ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে ফুল না হয়ে কাঁটা হলে অন্ধ বধুর যন্ত্রনাটা আরও বেড়ে যেত। দুর্যোগে আমাদের কৃষকেরা তো সেই অন্ধ বধুর মতই। তাই পায়ের নিচে সে যেন কাঁটার ছোঁয়া না, ফুলের ছোঁয়াই পায়।

হরিপদ কাপালি এবং তারপর?

†mt†Þ¤i 27, 2008, ˜wbK msev˜

ধানের জাত বৈচিত্র্যের জন্য আমাদের দেশ রাজার আসনে। প্রথম যুগের ধান বিজ্ঞানী ড. জি. পি. হেক্টর বলেছেন- এদেশে এক সময় আঠারো হাজার জাতের ধানের চাষ হতো। এই জাতগুলোর প্রত্যেকটির কোনো না বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। এবং সে গুলো যারা আবিষ্কার করেছিলো তারা নিশ্চয়ই চাষের সাথে জড়িত ছিলো। চাষবাস কোনোকালেও ভদ্রলোকের পেশা বলে স্বীকৃত ছিলো না। অবশ্য বৈদিক আর্যদের জীবন আচরণ-ধর্ম-কর্ম কৃষি নির্ভর ছিলো। তাদের জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি কৃষিচর্চার কথাও জানা যায়। ধান চাষের সাথে তারা যে পরিচিত ছিলো তার প্রমাণ ঋকবেদে আছে। আর্যদের এই সমাজতান্ত্রিক ভাবনা পরে আর বজায় থাকেনি। এক সময় বর্ণাশ্রম প্রথা চালু হয়। সাথে সাথে চাষবাসের এই কঠিন কাজটা পড়ে বৈশ্য এবং ক্ষেত্র বিশেষে শূদ্রদের ঘাড়ে। তাই এই আঠারো হাজার ধানের জাত আবিষ্কারের পিছনে আর্যদের সামান্য কিছু অবদান থাকলেও থাকতে পারে। তবে আবিষ্কারের সিংহভাগের দাবিদার ঐ বৈশ্য এবং শূদ্ররাই। যারা যুগ ও যুগধর্মের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে আবিষ্কারের এই প্রচেষ্টাকে আজ পর্যন্ত অব্যাহত রেখেছে। হরিপদ কাপালি এই পরিবারেরই একজন। তবে কাপালির দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য বলতে পারি না, তিনি আগের কালের কেউ না, এই যুগের মানুষ। যখন ধান আবিষ্কার করতে হলে ডিগ্রীধারী হতে হয়। তবুও কাপালি ধান আবিষ্কার করেছেন। মিডিয়ার কল্যানে তাঁর একটা নামও জুটে গেছে, হরিধান। মিডিয়া বলছেন, হরিধান ভালো ফলন দেয়। আর কাপালির প্রশস্তি শুরু হয়ে গেলো চার দিকে, কখনও বুঝে কখনওবা না বুঝে। পুরস্কৃত হলেন শ্রীযুক্ত কাপালি । সমাজের সাধারণ মানুষ থেকে অসাধারণ মানুষ, ক্ষমতাহীন থেকে ক্ষমতাধর, বহু লোকেই তাকে বিজ্ঞানীর অভিধায় অভিহিত করে নিলেন। এবং এখনও এই প্রশস্তির শেষ হয়নি। সবাই আবেগের সাথে বলছেন, আসলেই ধান আবিষ্কারের জন্য কোনো ডিগ্রীর দরকার নেই। এতকিছুর পর কাপালিবাবু কী আর সাধারণ মানুষ থাকতে পারেন? অসাধারণের আসনে আসীন হলেন। তার যে অর্জন মিডিয়ার কল্যাণে, কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ইচ্ছে করলে তাঁকে একটা সাম্মানিক ডিগ্রী দিয়ে দিতে পারেন। তবে সবাই যখন বলছেন ধান আবিষ্কার করতে ডিগ্রীর দরকার নেই, তাই তাঁর ঘাড়ে আর ডিগ্রীর ভার না চাপানোই ভালো।

কাপালির এই অসাধারণ প্রাপ্তিতে সবাই যখন খুশী, আমিও খুশী। আমি সর্বান্তকরণে চাই তিনি যেন তাঁর ঐ জায়গাটা শক্ত করে ধরে রাখতে পারেন। তবে আমি অন্য কথাও ভাবছি। যে লোকগুলো খামোখা দেশের মানুষের টাকা খরচ করে ডিগ্রী মাথায় নিয়ে ধানের উন্নত জাতের বীজ বানানোর কাজ করে যাচ্ছে, তারা না জানি আবার তাদের ডিগ্রীটাকে ভারি কিছু মনে না করে বসে। তাদের কেউ কেউ তো এটাও ভাবতে পারে, দরকার কী ভারি ভারি ডিগ্রীর। এগুলোকে বিসর্জন

দিয়ে একেবারে সাদামাটা হলেই ভালো। ডিগ্রী দিয়ে আজকাল সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা কম। কারণ তারাতো আর হীরক রাজার বিজ্ঞানীর মতো আত্মভোলা না। তারা সবাই ভালোমতো স্বার্থপর। তাদের বৌ- ছেলে-মেয়ে আছে। সমাজ-সংসার আছে। তারা যেমন ভাতের কাঙাল। তারা তেমন নামেরও কাঙাল। অথচ নামতো দূরের কথা বদনামের বোঝাটা বেজায়ই ভারি হয়ে যাচ্ছে তাদের জন্য। কখনও মিডিয়া কখনও বা কর্তা-ব্যক্তিরা অপবাদ দিয়ে থাকেন, " তারা মাঠে যায় না। তারা ঘরে বসে থাকে। তারা অপচয় করে। বিগত ছত্রিশ বছরে জাতির জন্য তারা সামান্যই করতে পেরেছে। পক্ষান্তরে আঠারো হাজার ধানের জাতের প্রায় সবগুলোকেই নকি ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছে"।

এই সমস্ত বিজ্ঞানীদের ব্যাপারে সাধারণ মানুষেরও কোনোপ্রকার আগ্রহ নেই। একটা জলজ্যান্ত উদাহরণ দিচ্ছি। বছর তিনেক আগের কথা। মাদারীপুর জেলা সদরে বীজ মেলা চলছে। মেলায় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের একটা স্টল ছিলো। সেখানে এক চাষিকে দেখলাম খুব আগ্রহভরে বীজ দেখছেন। তার আগ্রহ দেখে আমার ভালো লাগলো। কারণ এই বীজের পিছনে ভারি মাথায় যারা মাথা খাটান তাদের সাথে আমারও কিছুটা যোগাযোগ আছে। কেতাদুরস্ত এই চাষিভাইকে জিজ্ঞাসা করলাম কী দেখলেন। তিনি চট-জলদি জবাব দিলেন, দ্যাখলাম ভালোই। সবতো পরের ধনে পোদ্দারি। পারলে নিজেরা একটা জাত বের করে দেখান। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এবার কী ধানের চাষ করেছেন। তিনি সাফ জবাব দিলেন, কেন ইরি ২৮ নম্বর, ২৯ নম্বর। বলা বাহুল্য তিনি বলছিলেন ব্রি ধান২৮ বা ব্রি ধান২৯ এর কথা। তদ্দিনে হরিবাবু বিখ্যাত হয়ে গেছেন। ভাবলাম, এ দেশে সাধারণ একজন হরিবাবু হরিধান বানিয়ে বিখ্যাত হয়ে যান সহজেই। আর কিছু মানুষ কাঁড়ি কাঁড়ি বেতন নিয়ে কিছুই করতে পারে না বলে অহরহ বদনামের ঘানি টেনে যাচ্ছে। অথচ যে লোক বদনামটি গাইলো, সে এই বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের ধান জন্মিয়ে তার ঘরেই তার বদনাম করে গেল। আসলে তাদের কোনো দোষ নেই। তারা মিডিয়ার মারফতে কিছু জ্ঞানী-গুণীদের কাছে যা শুনেন তাই মনে রাখেন, এবং তাই বলে বেড়ান।

হরিবাবু যে ধান আবিষ্কার করেছেন, তা বিআর ১১'র কোন দলছুট উপজাত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। সেই ধানটি জাত হিসেবে কতখানি গ্রহণযোগ্য তা ব্রি'র পক্ষ থেকে বহুবার বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু সে কথা কেউ কানে তুলেনি। একথা বহুবার বলা হয়েছে, হরিধানের চেয়েও ফলনশীল কৌলিক সারি ব্রি'র হাতে আছে কিন্তু সেগুলোকে ব্রি জাত হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না। তার পিছনে অনেক বিজ্ঞানসম্মত কারণ আছে। কিন্তু এ কথা শুনবার বা প্রচার করবার কেউ নেই। হরিবাবু হয়তো সাধারণ মানুষের অনুকম্পা পেয়ে থাকবেন। মিডিয়ার নজরও সেদিকে। সম্প্রতি বাংলাদেশে গানের তারকা নির্বচন করা হচ্ছে। এখানে বিচারকদের চেয়ে এসএমএসুকারীদের ভূমিকা বেশি থাকে বলে এক শ্রদ্ধাভাজন এক শিল্পীর মন্তব্য ছিলো। এখানে শিল্পীর গুণের চেয়ে সে কোন পরিবেশ থেকে আসলো বা সে সমাজের কোন অংশের প্রতিনিধিত্ব করছে তার গুরুত্ব দেয়া হয় বেশি। গানের বেলায় যেমন, ধানের বেলায়ও তেমন। ডিগ্রীধারীরা কোথাও কল্কে পাচ্ছে না।

জসীম উদ্‌দীনের 'বাঙালির হাসির গল্পে' এক নাপিত ডাক্তারের কথা আমরা হয়তো অনেকেই জানিনে। তিনি ফোঁড়া কাটতেন। এ ব্যাপারে তার কোনো শিক্ষা-দীক্ষা ছিলো না। রোগী আসলে তিনি সম্ভবয় তার নিজের মতো করে ব্যবস্থা করে দিতেন। একাজে খরচা বেশি লাগার কথা না। নাপিতের পসার বেড়ে গেল। পাশেই ডিগ্রীধারী ডাক্তারের চেম্বার। তার একটু পোস-পাস বেশি। ভিজিটও বেশি। তাই রোগীপত্তর তেমন নেই। ডাক্তার বাবুর বসে বসে কেবল মাছি মারা অবস্থা। দিন যায়, মাস যায়। এই ভাবেতো চলতে পারে না। অবশেষে তিনি ঠিক করলেন, নাপিতকে অন্তত অ্যানাটামি বিষয়ে সামান্য কিছু জ্ঞান দিতে হয়। তাই করা হলো। নাপিত দেখলেন, ফোঁড়ার জায়গায় শুধু ফোঁড়া না, অসংখ্য শিরা-উপশিরা-ধমনি দিয়ে সূক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম সব কায়-কারবার। ডাক্তার বললেন, রক্ত বের হয় হোক, দেখবেন শিরা গুলো যেন রক্ষে পায়। এরপর থেকেই নাপিতের ক্ষুর ধরতে হাত কাঁপে। যেখানেই ধরতে যান, ভাবেন এই বুঝি অমুক শিরাটা কেটে যায়। অবশেষে তার ডাক্তারিবিদ্যার ইতি টানতে হলো। এই গল্পের পর আর কী বলার থাকতে পারে? বোধ হয় ডিগ্রীধারীর ডাক্তারেরও দরকার আছে।

ফরিদপুরের ভাঙ্গার এক বীজ ব্যবসায়ীর সাথে আমার একসময় পরিচয় হয়। তার বীজ ব্যবসার সরকারি যত কাগজ পত্র থাকতে হয় সবই আছে। এমনকি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকর নাকি তাঁর কনসালটেন্ট, তাও সানন্দে জানালেন। স্বল্প-শিক্ষিত এই ব্যবসায়ী তার কিছু সংযোগ চাষির মাধ্যমে বীজ সংগ্রহ করে থাকেন। এহেন বীজ নেই যা তিনি বাজারজাত করেন না। তবে নিজের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের নামে সিল দিয়ে। দেখেছি 'সুরেশ্বর' নামের বিখ্যাতে ডাটার বীজ তার কোম্পানির নামে। যেন তারই আবিষ্কার। এই ডাটার বীজ হয়তো আরেক জনও বাজারজাত করে। সেখানে হয়তো তার কোম্পানির নামে বাজারজাত হয়। এযেন একই অষুধ, কিন্তু কোম্পানি ভেদে নাম ভিন্ন নাম। তাঁর এই কর্মকাণ্ড নিয়ে আমি তেমন ভাবিনি। আমার ভাবনার বিষয় ছিলো অন্য জায়গায়। তিনি আমাকে অবলীলায় বললেন যে তিনি একটি ধান আবিষ্কার করেছেন। নাম *সাদা স্বর্ণা*। স্বর্ণার নাম জানি। উত্তর বঙ্গের অনেক জায়গায় চাষ হয়। ভারতের একটা মেগা ভ্যারাইটি। এর খোল পচা রোগ হয় প্রচুর। তবুও চাষিরা করে কয়েকটা কারণে। তাহলো, এদের গাছগুলো গাঢ় সবুজ। এবং ফলন ভালো। এই জাত আবাদ করলে আমাদের দেশে খোল পচা রোগ বেড়ে যেতে পারে, একথা বলে কৃষকদেরকে বুঝানো যায়নি। হয়তো একইভাবে ভারত থেকে আরেকটি জাত পাচার হয়ে এসেছে। ধানের রং সোনালী না বিধায় সাদা স্বর্ণা বলা হচ্ছে। এবং ভাঙ্গার এই বীজ ব্যবসায়ী উত্তর বঙ্গে চাষ হওয়া ধানটিকে নিজের বলে চালিয়ে দিচ্ছেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কী ভাবে আবিষ্কার করলেন। তিনি কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি। অথচ এবারে এক পত্রিকার খবরে দেখলাম, এই ভদ্রলোক সাদা স্বর্ণা ধান উত্তর বঙ্গেই অবৈধভাবে প্যাকেট জাত করতে গিয়ে ধরা খেয়েছেন। অর্থাৎ এবার তাঁকে আদালতের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে। পরের খবর আর কোথাও দেখিনি। রাজশাহির তানোরের এক চাষির জমিতে ধান গবেষণার পক্ষ থেকে মাঠ পর্যায়ে কিছু পরীক্ষাকার্য চালানো হয়। এরপরেই সেই চাষি তানোর-১, তানোর-২ নামে ধানের জাত আবিষ্কারের ঘোষণা দেয়। শুনেছি তিনি ধানের সংকরায়ণ-প্রক্রিয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। পত্রিকায়ও খবর হয়। এভাবে বাংলাদেশের আনাচে কোনাচে আরও অনেক চাষি আছে যারা নতুন ধানের জাত বের করার স্বপ্নেবিভোর। ঝিনেদা থেকে আরও বীজ আবিষ্কারকের খবর জানা গিয়েছিল। হরিবাবু ইতোমধ্যেই অনেককেই

হয়তো বীজ উদ্ভাবনে অনুপ্রাণীত করেছেন। সমাজের দায়িত্বশীলরাও এতে ইন্ধন যোগাচ্ছেন দেখা যাচ্ছে। তাই হরিধানের মত আরও অনেক ধানের জাত এখন বাজারে এসে যাবে। এরপর হয়তো ধান গবেষণার মত প্রতিষ্ঠানের ভার অনেক খানি কমে যাবে। বীজ অনুমোদন সংস্থার দরকার হবে না। সাথে সাথে সরকারেরও কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। পরিণতিতে বাজার অযোগ্য ধানের বীজে ভরে যাবে। নিয়ন্ত্রন-বিহীন এইসব বীজ হয়তো জাতীর জন্য আরেকটি দুর্ভোগ বয়ে আনতে একটুও কসুর করবে না।

এমনকি বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া কয়েকটি হরিধানের নমুনার ডি এন এ ফিঙ্গার প্রিন্টও করা হয়। উল্লেখ্য এই নমুনা গুলোর ফিঙ্গার প্রিন্টের মধ্যে মিলের চেয়ে অমিলই বেশি ছিল। হরিধান নিয়ে ব্রিতে ট্রায়াল হয়েছিল। কেউ হয়তো ভাবতে পারেন তাতে পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো। যাহোক গত বছর হরিবাবুর জমিতেই আরেকটা ট্রায়েল হয়। তাঁর নিজের জমিতে ব্রি-র বিজ্ঞানীদের তত্ত্বাবধনে শুধুমাত্র ফলন কতখানি দিতে পারে তা নিয়ে ছিলো এই ট্রায়েল। কিন্তু ব্রি-র বিজ্ঞানীদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির বাধা কাপালির এই কৌলিক সারিটি পেরুতে পারেনি। মিডিয়াতে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীদের সাক্ষাতকার এসেছিল। কিন্তু মহাভারতের সেই *অশ্বত্থামা হত ইতি গজ'র* মত। এব্যাপারে জাতিয় দৈনিক নয়া দিগন্তে আমি কিছু কথা লিখেছিলাম, " কৌরবের পক্ষে যুদ্ধকৌশল রচনারত অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যকে তাঁর পুত্র অশ্বত্থামার মিথ্যে মৃত্যুর সংবাদ দিয়ে মানষিক ভাবে দুর্বল করে দেওয়ার দরকার হয়। কে করবে এই কাজটা। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির! তিনি মিথ্যা বলতে পারেন না। এ কথা সবার মত দ্রোণাচার্যেরও জানা। যুধিষ্ঠির জানেন অশ্বত্থামা নামে একটি হাতি (গজ) মারা গেছে। তাই কারও কূটকৌশলে যুধিষ্ঠিরকে পাঠানো হলো সর্বজন শ্রদ্ধেয় দ্রোণাচার্যেরও কাছে, অশ্বত্থামার মৃত্যুর খবর জানানোর জন্য। এমন আর কি কঠিন কাজ? যুধিষ্ঠিরের খবর পরিবেশনের শেষ পর্যায়ে লুকিয়ে রাখা ডঙ্কা-নিনাদ করা হয়। ফলে দ্রোণাচার্য *গজ* কথাটা শুনতে পানি। তিনি নিজের ছেলে অশ্বত্থামা মারা গেছে বলে ধরে নেন। তাঁর এই মানষিক ভাবে ভেঙে পড়া পাণ্ডবদের জয়ে অনেকখানি সহায়ক হয়েছিল বলে মনে করা হয়। কুরুক্ষেত্রের এই ধর্মযুদ্ধে যতই *ধর্মসংস্থাপনার্থায়* বলা হোক না কেন, যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে দ্রোণাচার্যকে যে ভাবে প্রতারিত করা হয় তা কি আদৌ আইন সিদ্ধ? একই অভিযোগের তীর ছোঁড়া যেতে পারে কিছু কিছু মিডিয়া ব্যাক্তিত্বদের দিকে। যারা জাত উদ্ভাবনের প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন না করেই হরিপদ কাপালিকে নিয়ে বড় বেশি মাতামাতি করেছেন"।

যাহোক জাত উদ্ভাবনের বর্তমান কাতারে হরিবাবু যেহেতু এক নম্বরে আছেন। তাই তাঁকে সবিনয়ে কিছু অ্যানাটমি শিক্ষা দেওয়া আমার কর্তব্য বলে মনে করি। তাঁকে অবশ্যই বুঝতে হবে, শুধুমাত্র ফলন বেশি পাওয়া মানেই ভালো জাত নয়। হরিধান সময় বেশি নেয়। অথচ ব্রি এখন সময় কমিয়ে আনার চেষ্টা করছে। বিআর১১ থেকে ব্রিধান ৩০ ব্রিধান৩১, এবং ব্রিধান ৩২ এর জীবন কাল ক্রমান্বয়ে কমে এসেছে। ব্রিধান ৩৩ এর আরও কম সময় লাগে। মনে রাখতে হবে, আমনের পর আরও ফসল করতে হবে। হয় গম না হয় যেকোনো রবি ফসল। এই সময়ে আবার খরার উপদ্রব দেখা দেয়। তাই জাতটা এমন হওয়া চাই যেন খরাটাও সহ্য করতে পারে। এটা গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর যুগ। কখন মওসুমের কি পরিস্থিতি হয় ঠিক নেই। কখন কোন রোগটা, কোন পোকাটা ঘাড়ে চেপে বসে তারও ঠিক নেই। তাই এখন যদি জাত বের করতে

হয় তাহলে এই ব্যাপারগুলো অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। আরও একটা জরুরী কথা। এক সময় ধান গবেষণার মতো কোনো প্রতিষ্ঠান ছিলো না। তখন জাত বের করতে হলে খুব একটা বাছ-বিছারের দরকার হতো না। আলাই-বালাই তেমন ছিল না। ঝরা-খরার সমস্যা নিয়ে তেমন একটা ভাবার দরকার পড়তো না। চাষ করতে গিয়ে নিজের পরিবেশে যেটা ভালো ফলতো, নিজের কাছে বিশেষ ভাবে উপযুক্ত মনে হতো সেটাই মানুষের মুখে মুখে জাত হয়ে যেত। সরকারি কোনো ছাড়পত্রের দরকার হতো না। দেশে দেশে সুনির্দিষ্ট বর্ডার ছিল না। তাই এক দেশ থেকে আরেক দেশে বীজ দেয়া-নেয়ার জন্য কোনো কোয়ারন্টাইন বিধির প্রয়োজন ছিল না। নির্দিষ্ট কোনো জাতের ডি. এন. এ. ফিঙ্গার প্রিন্ট পদ্ধতি ছিল না। জাতভেদে নির্দিষ্ট কোনো কৃষিতাত্ত্বিক বা বালাই ব্যবস্থাপনার পরামর্শ প্যাকেজও দেওয়ার দরকার পড়তো না। আর এখন যুগের প্রয়োজনে এগুলো সবই দরকার হয়। উপরন্তু মেধাস্বত্ব বলে আরেকটি জিনিষ চালু হচ্ছে। তাই মাঠে-ময়দানে ধানের জাত আবিষ্কারের চিন্তা বুঝে-শুনে করা উচিৎ।

আমাদের কৃষি প্রধান দেশ। কৃষিকে নিয়ে সবাই কিছু একটা করার স্বপ্ন দেখে। সাধারণ মানুষের ভালোবাসা পাওয়ার এটাও একটা মোক্ষম উপায়। রাজনীতিবিদ্, অর্থনীতিবিদ্ এবং আরও অনেকেই সময়সুযোগ মতো মাঠে-ময়দানে শুধু কৃষিকে নিয়ে উপদেশ দিয়ে যান। জেনে বুঝে উপদেশ দিলে কোনো কথা নেই। কারণ যার কাজ তারই সাজে।

Z_¨chw³ Ges Kw I

Technology Today, September, 2008

কৃষি-প্রযুক্তি বিস্তারে একসময় রেডিওর ভূমিকা ছিল ভালো। তারপর আসলো টেলিভিশন। উপস্থাপনা এবং পরিবেশনার কারিশমায় টেলিভিশনের কৃষি-প্রোগ্রাম খুবই জনপ্রিয়তা পায়। ফলশ্রুতিস্বরূপ হাল আমলের অনেক চ্যানেলেই বিভিন্ন আঙ্গীকে কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। কোনো কোনো চ্যানেলে খবরের মধ্যে কিছু সময় কৃষির জন্য বরাদ্দ থাকে। ইন্টারনেট এবং মোবাইল ফোন এখনরেডিও-টেলিভিশনের জায়গা দখল করছে। সাধারণভাবে তথ্য-প্রযুক্তি বলতে আমাদের মাথায় এই দুটো মাধ্যমেই এসে যায়। কৃষির তথ্য প্রবাহের আধুনিকায়নে এই দুটো মাধ্যম কেমন ভূমিকা রাখতে পারে তা দেখা দরকার।

জাপানের একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। আমার বাসার তিন দিক ঘিরে ছিল সবজি আর ফলের বাগান। মালিক বুড়ো আর বুড়ি। তাদের ছেলে মেয়েদের কোনোদিন বাগানে দেখিনি। হয়তো তারা বড় শহরের আলো-ঝলমলে পরিবেশে অন্য কোনো কাজ করছে। চাষবাস আমাদের দেশের মতই নতুন প্রজন্মের কাছে খুব একটা পছন্দের না। কিছু জমিজমা ছিল। চাষবাস পৈতৃক পেশা। তাই বুড়ো আর বুড়ি, এই দুজনে মিলে তাদের পুরোনো ঐতিহ্যটা ধরে রেখেছে। সময় থাকলে আমি আর আমার মেয়ে মিলে ওদের এই ধীর অথচ গতিময় সেই বাগান করা উপভোগ করতাম। তারা জমিতে আসতেন মাথায় টুপি, পায়ে গামবুট আর হাতে হাতমোজা পরে। তারপর যন্ত্রের মতো ছোটখাটো হাত-যন্ত্র দিয়ে লেগে যেতেন বাগানের কাজে। কয়েকমাস পরেই দেখতাম, বড় বড় মূলো, রসুন কিংবা শসার সম্ভার। ফুলও দেখেছি প্রচুর। কাজের মধ্যে কেমন একটা ছন্দ ছিল। ঘোরের মধ্যে ডুবে যেতাম আমি। যেভাবেই শুরু হোক, শেষ হতো যন্ত্রপাতি আর ধোয়ামোছার জায়গাটা পরিষ্কার করে। একদিন সকালে দেখলাম, যন্ত্রপাতি ধোয়ামোছা হলো। কিন্তু কাজের জায়গা ধোয়মোছা হলোনা। ভাবলাম ভুলে গেলো নাকি!। ব্যতয় দেখে জিজ্ঞাসা করলাম কাজ শেষ? বুড়োর জবাব শুনে আমার অবাক হওয়ার পালা। বিকেলে বৃষ্টি হবে; এবং আগামী কালও বৃষ্টি হবে। তাই ধুয়ে আর কি হবে? তার খবর আছে। বুড়ো নিশ্চয়ই নিশ্চিত ছিল, তাই আর ধোয়া-পায়লার ঝক্কিতে যায়নি। আমি কথা বাড়াইনি। দেখা যাক বৃষ্টি হয় কিনা! সত্যি বিকেলে বৃষ্টি হলো। মাটি আর ধূলো-বালি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেল। পরের দিনও বৃষ্টি হলো। আবহাওয়ার পূর্বাভাষ এমন দাগে-দামে ফলে যায় আগেতো কখনও দেখিনি। পরে জেনেছি। আবহাওয়ার খবর শুধু টেলিভিশন বা রেডিও না,

ইন্টারনেট থেকেও জানা যায়। আজ থেকে আট বছর আগের কথা। তখনই জাপানের গ্রামে গ্রামে কৃষি আবহাওয়া পৌঁছে দেওয়ার মোক্ষম উপায় হিসেবে তথ্যপ্রযুক্তির পুরোদস্তুর ব্যবহার শুরু হয়ে গেছে। এতো গেলো আবহাওয়ার কথা। আর কৃষিপ্রযুক্তি? ইয়ামাগাতা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ছিল ৎসুরুওয়াকা নামের একটা ছোট্ট মফস্বল শহরে। সেখানকার কৃষি অফিসের নিজস্ব হোম-পেইজ ছিল। নিয়মিত নতুন তথ্য দিয়ে তা ভরাট (update) করা হতো। ফিলিপিনের আন্তর্জাতিক ধান গবেষণায় করা আমার পি-এইচ. ডি থিসিসের কিছু অংশ ওদের স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের সামনে উপস্থাপন করতে হয়েছিল। যা ছিল কাদাজমিতে ধানের বুনা-প্রযুক্তির (Wet seeding: পেঁকি বাইন) উন্নয়ন সংক্রান্ত। নেহায়েতই সাদামাটা একটা কাজ। ওরাও এ ধরনের প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য বহুদিন ধরে কাজ করে আসছে। এই প্রযুক্তিতে পরিশ্রম ও খরচ দুইই বাঁচে। পেপার উপস্থাপনের বেশ কিছুদিন পর আমার কাছে চিঠি আসলো। আমার কাজটাকে তারা চাষিদের উপযোগী করে জাপানি ভাষায় অনুবাদ করেছে। আমার যদি সায় থাকে তাহলে তাদের যে হোম-পেজ আছে, সেখানে তারা তা প্রকাশ করতে চায়। কাজটা ছিল ১৯৯৪ সালের। এই ঘটনা ১৯৯৯ এর। ইতোমধ্যে কয়েকটা জর্নাল-প্রসিডিংসে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের স্টাইলে এগুলো প্রকাশিত হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে Japan Society for the Promotion of Science Fellow হওয়া গেলো। সেটাকেই সহজ সরল ভাবে জাপানি চাষিদের জন্য প্রকাশ করা হবে। বলা বাহুল্য, আমার গররাজী হওয়ার কোনো কারণ ছিল না। যথারীতি হোমপেজে প্রকাশিত হলো। আমি জানিনা ক'জন চাষির তা কাজে এসেছিল। পরে আমার ল্যাবের গ্রাজুয়েট-ছাত্রদের জিজ্ঞেস করে জেনেছিলাম যে জাপানি চাষিরা অনেকেই ইন্টারনেট ব্যবহার করে থাকে। অতএব কেউ না কেউ কিছু না কিছু উপকৃত হয়েছিল বলা যায়।

এই ঘটনাসমূহের অবতারনা, শুধুমাত্র একটি কথার জন্য। কৃষিতে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার। এ্টাতো আমার দেখা বেশ ক'বছর আগের কথা। এখন অবশ্য এই অবস্থার আরও অনেক উন্নতি হয়েছে। কারণ সাধারণ প্রযুক্তি যদি রৈখিক ধারায় চলে তবে তথ্য-প্রযুক্তি নিশ্চয়ই ন্যাচারাল লগের নিয়মে চলছে।

সারা পৃথিবীর অর্ধেকের বেশি মানুষের প্রধান খাবার ধান। ধান নিয়ে একটা আন্তর্জাতিক গবেষণা ইনস্টিটিউট আছে। এছাড়াও এশিয়া-আফ্রিকার অনেক দেশেই ধান নিয়ে গবেষণা করবার জন্য এক বা একাধিক প্রতিষ্ঠান আছে। ১৯৬০ থেকে ১৯৮০'র দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত পৃথিবীর তাবদ্ উন্নয়নকামী বিশ্বে যে AwaK Lvevi djvl আন্দোলন হয়েছিল তা সবুজ বিপ্লব নামে পরিচিত। যখন-তখন দুর্ভিক্ষের শিকার ভারত ছিল এই বিপ্লবের প্রথম সারিতে। সাথে পাকিস্তানও (অতএব আমরাও এর বাইরে ছিলাম না)। আমাদের স্বাধীনতার পর খাদ্য উৎপাদনের তাগিদে ফলাও করে সবুজ বিপ্লবের কথা বলা হয়েছে। এই বিপ্লবের প্রধান দুটো উপাদান ছিল গম এবং ধান। গম দিয়ে শুরু। আর ধান দিয়ে তার চূড়ান্ত অর্জন বলা যায়। নেপথ্যে ছিলেন নবেল-লরেট কৃষি বিজ্ঞানী ড. নরম্যান বোরলগ আর সামনে ভারতীয় কৃষি বিজ্ঞানী ওয়ার্ল্ড ফুড এবং র‍্যামন ম্যগসাইসাই লরেট ড. মনকম্বু সম্বাশিবন স্বামিনাথন (পরে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ছিলেন)। পাকিস্তান এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশে এই আন্দেলনের হয়ে কাজ করেছেন কৃষিবিজ্ঞানী ড. কাজী এম বদরুদ্দোজা ও সাবেক আমলা জনাব আনিসুজ্জামান। ধান গবেষণার অগ্রপথিক ড. মো. আমীরুল আসলাম, ড. শাহ্ মো. হাসানুজ্জামান, ড. মুন্সি সিদ্দিক আহ্‌মাদ প্রমুখকে একই দলে ফেলা যায়। ভারতের এই বিপ্লব অনেকটা গণ বিপ্লবে পরিণত হয়। পাশ্ববর্তী দেশ হিসাবে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে এই বিপ্লবের ধাক্কা লাগে। আমরাও খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করতে পেরেছি বা খাদ্য উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করতে পেরেছি। তবে আমাদের এই অর্জন সবুজ বিপ্লবের সোনালী সময়ের বেশ পরে। তবে এই অর্জনের ভিত্তি ছিল সবুজ বিপ্লব তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

হ্যাঁ। যে কোনো বিপ্লবই প্রতিবিপ্লবে রূপান্তরিত হতে পারে যদি তার অপব্যবহার হয়। সবুজ বিপ্লবের বেলায়ও এমনটি হয়েছে বলে মনে করার কারণ আছে। প্রথমেতো পেটের ক্ষুধা। তারপর অন্য চিন্তা। সবাই যেন ভুলে ছিল এরপর কি হতে পারে। মার্কিন কৃষিবিজ্ঞানী উইলিয়াম গাড্ খাদ্য উৎপাদনের এই বিপ্লবকে সবুজ বিপ্লব বলে অভিহিত করেন ১৯৬৮ সালে। ১৯৬৭ থেকে ড. স্বামিনাথন দুঃশ্চিন্তায় ছিলেন। দেখলেন চাষিরা বেশি উৎপাদনের আশায় অনিয়ন্ত্রিত সারের ব্যবহার করছে। সাথে কীট নাশকের অযাচিত ব্যবহার। তিনি ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন এই বিপ্লব ক্ষুধা নিবৃত্তির সমাধান দিচ্ছে বটে কিন্তু তা সাময়িক। সাথে বিরাট পরিবেশ বিপর্যয়ের বীজও রোপিত হচ্ছে। তিনি ১৯৬৮ সালে বারানসী শহরে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের কৃষিবিজ্ঞান সেকশনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণে এই আশঙ্কাই ব্যক্ত করেছিলেন। অবশেষে সবুজ বিপ্লব ফিকে হওয়ার পরিণতি তিনি প্রত্যক্ষ করলেন। ১৯৯০ সালের দিকে শুরু হলো তাঁর নতুন পথ চলা। পূর্ব প্রস্তুতি নিশ্চয়ই ছিল। তখন থেকেই বলতে শুরু করলেন, "এমন এক সবুজ বিপ্লব চাই যা কোনো দিনও

ফিকে হবে না"। আর তা হলো চির সবুজ বিপ্লব। তিনি ঘোষণা দিলেন, " অবশ্যই আমরা বেশি ফলনের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবো। তবে তা হতে হবে পরিবেশ বান্ধব। তা কখনওই একক ফসল ভিত্তিক হবে না। হবে সমন্বিত খামার ভিত্তিক। এবং এই কাজে বিজ্ঞানীদেরকে জৈব প্রযুক্তি, মহাশূন্য-প্রযুক্তি, নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার, বাজার-ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি এবং তথ্যপ্রযুক্তির যথাযথ সমন্বয় ঘটাতে হবে"। গরীব ধনীর ব্যবধানকে তিনি অগ্রাহ্য করলেন। তাঁর ভাষায় শুধুমাত্র গরীব বলেই কাউকে প্রযুক্তি থেকে দূরে রাখা যায় না। আধুনিক বিজ্ঞান সত্যি চমৎকার। শুধু চাই তা দিয়ে সবাইকে আলোকিত করা।

তিনি তাঁর কৃতকর্মের কারণেই তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর নজরে আসতে পেরেছিলেন। আমাদের স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে এসেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সাথে তার মোলাকাত হয়েছিল। তিনি যে সবুজ বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন তা স্বামিনাথনের সাথে আলাপের ফলশ্রুতি কিনা কে জানে! সাবেক প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের সময় প্রধান মন্ত্রীর অফিসে টেকসই খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির তাগিদে তিনি এক জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। স্বামিনাথন তাঁর বক্তব্য শুরু করেছিলেন বঙ্গবন্ধুর সাথে তাঁর সাক্ষাতের সূত্র ধরে। পশ্চাদপটে বঙ্গবন্ধুর বিরাট একটা প্রতিকৃতি ছিল। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর একটু ভাবাবিষ্ট হওয়া ছিল স্বাভাবিক। আমরা ধান-বিজ্ঞানীরা সামনে বসে সেই বক্তৃতা শুনেছিলাম। তিনি তাঁর স্বাভাবিক ভাষায় অস্বাভাবিক সব কথাগুলো বলেছিলেন। সেখানে আধুনিক বিজ্ঞানের লাগসই প্রয়োগের কথা ছিল। তথ্য প্রযুক্তির কথা অবশ্যই ছিল। মহান এই কৃষি-বিজ্ঞানীর কাছে তথ্যপ্রযুক্তি বোধ হয় খুবই প্রিয় বিষয়। তিনি শুধু চির সবুজ আন্দোলনের কথাই বলেন না। হয়তো একই কথা আরেক সুরে বলেন তা হলো জ্ঞানের বিপ্লব। আর তিনি তাই করতে চেয়েছেন ভারতের ৬০০,০০০ গ্রামকে কম্পিউটার এবং ইন্টারনেটের আওতায় এনে। তার প্রতিষ্ঠিত এম এস স্বামিনাথন রিসার্স ফাউন্ডেশন এর কার্যক্রম সম্বন্ধে অবহিত হতে গেলে অন্তত তাই মনে হয়।

আর আমরা কী করছি? আমাদেরও কৃষি বিপ্লব হয়েছে। আমরা প্রায় তিন গুণ খাদ্য ফলিয়ে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করেছি (এখানে অবশ্যই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণেরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে)। কিন্তু কোনো একটা দৈব-দুর্বিপাক দেখা দিলেই আমাদের খাদ্য-পরিস্থিতি একেবারে নাজুক হয়ে পড়ে। আমাদের প্রধান খাদ্য ধান একটি রাজনৈতিক ফসল তা আমরা সব সময়ই হাড়ে হাড়ে অনুধাবন করি। এ সংক্রান্ত যথেষ্ট প্রযুক্তি আমাদের আছে। সে গুলো মাঠে নেওয়ার জন্য গতানুগতিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাও চালু আছে বাংলঅদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে। তবুও যেন চাষিদের চাহিদা মেটাতে যতখানি যা করা দরকার তা যেন হচ্ছে না। একথা মাথায় রেখেই ধান গবেষণায় তথ্যপ্রযুক্তির যথাযথ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তবে তৃণমূল পর্যায়ে কম্পিউটার নিয়ে যাওয়ার সুনির্দিষ্ট আশার বাণী এখনও শোনার অপেক্ষায় দেশবাসী। তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় আমাদের আছে। তাই বিশ্বাস করবার কারণ আছে যে তৃণমূল পর্যায়তক্ কম্পিউটার-ইন্টারনেট একদিন ছড়িয়ে পড়বে। এদেশে ধান গবেষণাই (ব্রি) এখন পর্যন্ত একটি মাত্র কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান যার নিজস্ব একটি দ্বিভাষিক (বাংলা এবং ইংরেজি) নলেজ ব্যাঙ্ক (Knowledge Kank) আছে। সেটা হলো রাইচ নলেজ ব্যাঙ্ক (Rice Knowledge Bank)। যার ওয়েব পেজ হলো www.riceknowledgebank.brri.org। আর ব্রি'র নিজস্ব হোম পেজ হলো www.brri.gov.bd । একাজে ব্রি তার নিজস্ব সার্ভার ব্যবহার করে থাকে। এখানে ক্লিক করলেই একজন চাষি তাঁর প্রয়োজনীয় অনেক তথ্যই পাবেন। এখানে কোন ধান কবে কি ভাবে আবাদ করতে হবে, তার পরিচর্যা কি হবে, বালাই দমন ব্যবস্থা কি এসব কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করা আছে। তবে এই ওয়েব-পেজ তার শুরুর দিকে আছে বলা যায়। এখান থেকে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ইরি) রাইচ সলেজ ব্যাঙ্কে ঢুকা যায়। সেখানে রাইচ ডক্টর (ধানের ডাক্তার) বলে অদ্ভূত সুন্দর একটা অধ্যায় আছে। এই হোমপেজ ইংরেজিতে। তবে ফিলিপিনো, ইন্দোনেশিয়ান ভাষা, কম্বোডিয়ান ও থাই ভাষায় অনুবাদ করা আছে। এমনকি কিছু কিছু ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষায়ও এই পেজ অনুদিত হয়েছে। আমাদের হোমপেজের পূর্ণতা আসতে এখনও কিছু সময় দরকার। তাই আমি মনে করি ইরির এই হোম পেজ বাংলায়ও অনুবাদ করা উচিৎ। রাইচ নলেজ ব্যাঙ্কের মতো অন্যান্য ফসলেরও এই ধরনের নলেজ ব্যাঙ্ক থাকা উচিৎ। এই কাজ এখনই শুরু করতে হবে। এব্যপারে সময় ক্ষেপণের কোনো সময় নেই।

কৃষিতথ্য এবং কৃষি সংক্রান্ত আবহাওয়ার সময়োচিত তথ্য খাদ্য নিরাপত্তা-বৃদ্ধিতে খুবই কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে। এজন্য যথাযথ একটি কম্পিউটার-মডেল দরকার। কৃষি বা কৃষিতে আবহাওয়ার প্রভাব সংক্রান্ত যুগোপযোগী মডেল এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। তাই মাঝেমধ্যে ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ থাকে। এ বছর বোরো ফসল পাকার সামান্য কিছু আগে নার্গিস সামুদ্রিক ঝড় ধেয়ে আসতে থাকে। কৃষি বিভাগ কিসের ভিত্তিতে যেন নার্গিস থেকে ফসল রক্ষা করার খাতিরে কাচাপাকা ধানই কেটে ফেলার জন্য সারা দেশে প্রচার করে দেয়। এই অতিবিক্ত সতর্কতার কারণে কৃষি সম্প্রসারণ

বিভাগকে তিরষ্কার করা হয়। ভাগ্য ভালো নার্গিস আসেনি। আবহাওয়া দপ্তর যেমন বলেছিল তেমনই বাংলাদেশের উপর দিয়ে না এসে মায়ানমারের উপরদিয়ে চলে যায়। এ নিয়ে কৃষি অধিদপ্তরকে দোষারোপ করার কোনো কারণ নেই। পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণে তারা এখনও তথ্যপ্রযক্তির যে মাকড়শার জাল সেখানে এখনও প্রবেশ করতে পারেনি। যাহোক নার্গিসের প্রভাবে আমাদের জলবায়ুতে একটা পরিবর্তন দেখা দেয়। প্রচন্ড বৃষ্টির আশংকা ছিল। যদি বৃষ্টি হতো তা তাহলে কী হতো? যাহোক সে সময় শুধু চাষিরা না, স্কুল-কলেজের ছেলে মেয়েরা পর্যন্তও মাঠে নেমে ধান কেটে ঘরে এনেছিল। সেটা ছিল অভূতপূর্ব প্রণোদনা। প্রচার মাধ্যমে এগুলো ফলাও করে বলা হয়, দেখানো হয়। এখানে তথ্যপ্রযুক্তির নিশ্চয়ই একটা ভুমিকা ছিল বলে মনে হয়।

কম্পিউটার কবে নাগাদ সবার ঘরে ঘরে যাবে আমরা নিশ্চিত না। তবে উপজেলা পর্যায়ে আজকাল হরহামেশাই ইন্টারনেটের দোকান দেখা যায়। কল-সেন্টার বলে বেশ ভালো এক সম্ভাবনার কথা আমরা ইদানিং শুনছি। সব ফসলগুলোর যদি হোমপেজ থাকে তাহলে ইন্টারনেটের দোকানে গিয়ে কিছু অর্থের বিনিময়ে একজন চাষি তার দরকারী তথ্যটা পেয়ে যেতে পারেন। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করলে কল-সেন্টার কে কৃষি বিষয়ের তথ্য সংগ্রহের উপকেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলা যেতে পারে। এছাড়াও বাংলাদেশের প্রায় বাড়িতে আজকাল এক বা একাধিক মোবাইল ফোন আছে। এখানে যদি কৃষি সংক্রান্ত তথ্য ডাউনলোড করার সুযোগ থাকতো তাহলো ভালো হতো। এখানে ইচ্ছেমতো গান ইত্যাদি ডাউনলোড করা যায়। তাহলে কৃষি সংক্রান্ত বিষয়াদী বিশেষ ফর্মাটে ডাউনলোডের ব্যবস্থা করা যাবে না কেন? মাঝে মাঝে মোবাইলে দেখি মেসেজ আসে, " আপনার বাচ্চাদেরকে টিকা দিন বা ভোটার হোন এই জাতীয়"। এমনি ভাবে হয়তো কোথায় বীজ পাওয়া যাবে, বা এখন সারের দাম কত, কৃষি বাজার পরিস্থিতি কি, ধানের সারের ডোজ কোথায় কত হবে, কখন কি ভাবে দেবে এ গুলো চাহিদা মোতাবেক চাষির মোবাইলে ডাউনলোড করার ব্যবস্থা থাকা উচিৎ। এব্যাপারে মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলোর সাথে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান্ ওবং সম্প্রসারণ বিভাগের সমঝোতা হওয়া উচিৎ। কোনো কোনো মোবাইল কোম্পানি দিনে রাতে স্বাস্থ্য সেবার পরামর্শ দিচ্ছেন। কিন্তু স্বাস্থ্যের আগে আসে পুষ্টি ব্যবস্থাপনা এ ব্যাপারে তারা কোনো কিছু ভাবছেন না বোধগম্য না। তারপরও মোবাইল-প্রযুক্তি অনন্য প্রযুক্তি। কোম্পানি এগিয়ে না আসলেও ব্যাক্তি পর্যায়ে এই প্রযুক্তি বেশ কাজ করছে। আমরা ধানগবেষণায় যখন প্রশিক্ষণ দেই তখন নিজেদের মোবাইল নম্বরটা ট্রেইনিদেরকে দিয়ে দেই। তারা মাঠ থেকে সরাসরি আমাদের প্রশ্ন করেন। সাধ্যমত আমরা তাদের পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করি। এবারের বোরো কার্যক্রমের সময় ধান গবেষণার ৬১ জন বিজ্ঞানী মাঠ পর্যায়ে থেকেছেন। ধান গবেষণায় কাজ করলেও সবাই কিন্তু ধানের সব বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন না। পেশাগতভাবে তাদের অনেকেই ছিলেন অর্থনীতিবিদ, ইঞ্জিনিয়ার বা পুষ্টিবিশারদ। কিন্তু মাঠে পরামর্শ দেওয়ার সময় তাদের এই সব আলাদা পরিচয় তুলে ধরার কোনো অবকাশ ছিল না। তারা যখনই কোনো সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন তখনই মোবাইলের মাধ্যমে ধানের মাঠে চলতে চলতেই বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীর সাথে আলাপ করে নিয়েছেন। ব্রি'র মহাপরিচালক মহোদয়ও একইভাবে সব বিজ্ঞানীর সাথে যোগাযোগ রেখেছেন। একই সময় অনেক কৃষি কর্মকর্তা এমনকি অনেক কৃষকও মাঠের সমস্যা নিয়ে সরাসরি মোবাইল মারফৎ আমাদের অনেকের সাথেই আলাপ করেছেন। অনেক সময় অনেক মিডিয়া ব্যক্তিত্ব তাঁর রিপোর্ট প্রস্তুতের মূহুর্তে ধান গবেষণার সাথে আলাপ করে নিয়েছেন। আমি মনে করি বোরোর ফলন-বৃদ্ধিতে মোবাইল নির্ভর তথ্য প্রযুক্তির একটা বিরাট ভূমিকা ছিল।

আবারও জাপানের একটা উদাহরণ দিয়ে শেষ করছি। একবার আবহাওয়া খারাপের আলামৎ পাওয়া গেল। শুনলাম টাইফুন আসছে। আমার টোকিও যাওয়ার জরুরী দরকার ছিল দুএক দিন পর। টাইফুনের কি অবস্থা জিজ্ঞেস করতেই ল্যাবের এক সহকর্মী ইন্টারনেটে ক্লিক করলো। টাইফুন তখন কোথায় এবং কখন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আঘাত হানবে তার সব খবরই আছে। সে অনুযায়ী রাত দশটায় টাইফুন আঘাত হানলেও তা মারাত্মক হবে না। এখানে বৃষ্টি হলেও টোকিওর আবহাওয়া রোদ-ঝলমলে থাকবে। সেভাবেই আমার প্রোগ্রাম সাজিয়ে নিলাম। কারণ ঐ বুড়ো-বুড়ির কাছ থেকেতো শিখেছি আর যাই হোক টোকিওর আবহাওয়া রোদ ঝলমলেই হবে।

কুশি ধান: প্রযুক্তি হিসাবে কতখানি চলনসই

A‡±vei 11, 2008, ˜wbK msev˜

ধান গাছ কেটে নেওয়ার পর গোড়া থেকে আবার কুশি গজায় এবং এই কুশি থেকে উৎপাদিত ধান মঙ্গা মোকাবিলায় কাজে আসে। রবি ঠাকুরের 'জুতা আবিষ্কার' এর গবুমন্ত্রীর কথা মনে আছে নিশ্চয়। তার কথাই আমাকে পুনরোক্তি করতে হচ্ছে। 'আমারো ছিল মনে, কেমনে বেটা পেরেছে সেটা জানতে'। ধন্যবাদ আর-ডি-আর-এস (RDRS) , বাংলাদেশ এর জনাব মৃন্ময় গুহ নিয়োগকে। তিনি আমাদের ধানের কুশি নিয়ে খুশীর খবর দিয়েছেন। অন্তত তাঁর কাজের জায়গা বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুরের অনেক অনেক প্রান্তিক চাষিদের কাছে খুশীর খবরইতো বটে।

একটু পিছনে ফিরে যাই। গতশতকের শেষ দশকের কথা। আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (IRRI) তৎকালীন মহাপরিচালক ড. ক্লাউস ল্যাম্পে ধান গাছ নিয়ে তাঁর কিছু স্বপ্নের কথা বলেছিলেন। যেমন: ধান গাছ বহুবর্ষজীবী হবে। ১৬০ সেমি লম্বা হবে। রোগবালাই ও পোকামাকড়ের বিরুদ্ধে বহুমুখী প্রতিরোধ সপন্ন হবে। খরা এবং প্রতিকূল মাটিকে সহ্য করতে পারবে। শিকড় মাটির অনেক গভীরে নিয়ে যেতে পারবে। মাটির ক্ষয়রোধে সহায়তা করতে পারবে। নিজের নাইট্রোজেন নিজেই তৈরি করে নিতে পারবে। ইত্যাদি সব ভালো ভালো গুণ। তিনি ভেবেছিলেন সব গুণের গুণধারীর কাছে ফলনটা হয়তো একটু কম পাওয়া যাবে। তাই তাঁর কাঙ্খিত ফলন ছিল চলনসই (হেক্টরে ২-৩ টন)। ড. ল্যাম্পের আশা ছিল ২০২০ সাল নাগাদ এই স্বপ্নগুলো হয়তো পূরণ হবে। তাঁর দিক নির্দেশনায় কিছু কিছু কাজও শুরু হয়েছিল।

ধান গাছ মূলত বহুবর্ষজীবী হিসেবেই জল-জংলা থেকে তার আদি যাত্রা শুরু করে। পরে নতুন পরিবেশে মানুষের প্রয়োজনে তাকে ওষধি গাছের লেবাস নিতে হয়। অর্থাৎ এক বছরের মধ্যেই তার জীবনচক্র শেষ করতে হয়। তবুও আগের বৈশিষ্ট্য কিছু কিছু থেকে যায়। তার মধ্যে অন্যতম হলো ফসল কেটে নেওয়ার পরও তার নাড়ার গোড়া থেকে আবার নতুন গাছ গজানো। তবে জংলি পূর্বপুরুষের মধ্যে এই গুণ যতটা ছিল আজকের প্রজন্মের মধ্যে অতটা নেই। ড. ল্যাম্পের অনুসারীরা চাইছিলেন কীভাবে এই গুণাবলী বাড়ানো যায়। তারা আরও চাইছিলেন যে আধুনিক বৈশিষ্ট্যের সাথে ধানের গোড়ায় আদার মত কন্দ তৈরি করে (যা কার্যকরী ডেমি/কুশি/মুড়ি গজাতে সাহায্য করবে) বর্ষজীবী জাতের শুভ সূচনা করা । কিন্তু তিনি IRRI ছাড়ার সাথে সাথেই তাঁর এই স্বপ্নের অকালমৃত্যু ঘটে। বিজ্ঞানীরা অন্য দিকে ঝুঁকে পড়েন বেশি বেশি করে। IRRI' তে ড. গুরুদেব সিং কুশ এর নেতৃত্বে *নিউ প্ল্যান্ট টাইপ* নিয়ে কিছু বিজ্ঞানী আলোচনায় আসেন সারা বিশ্বে। ড. স্বপন দত্ত-করবী দত্তের (বাস্তব জীবনে স্বামী-স্ত্রী) ভিটামিন এ এবং আয়রন রাইচ পুষ্টি-হীনতার বিরূদ্ধে সম্ভাব্য পদক্ষেপ হিসেবে গবেষণা চলতে থাকে। কিন্তু সবার মধ্যে ব্যতিক্রমী ছিলেন তরুণ বিজ্ঞানী ড. পেং। গতানুগতিক ধারার সাথে সুর মিলিয়েও তিনি কিছুটা উল্টো হিসাব দেখালেন। তিনি দেখালেন, গ্লোবাল ওয়ার্মিং হলে কী হবে ধানের ফলনের অবস্থা। তাঁর এ গবেষণা ফলাফল ধান-বিজ্ঞানীদেরকে কিছুটা নতুনভাবে ভাবতে শিখালো। তবে সামগ্রীক বিচারে এটা এমন ভিন্ন কিছু ছিল না। সারা পৃথিবীর বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিজ্ঞানীরা ইতোমধ্যেই তাঁদের নিজ নিজ ক্ষেত্রের গবেষণার সাথে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর হিসেব কষতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তাদের অনেকের কিছু কথা এক সাথে করলে কৃষির ব্যাপারটা এই দাঁড়ায় যে, অদূর ভবিষ্যতে কখনও অতিবৃষ্টি হবে। কখনও অনাবৃষ্টি হবে। অনেক জায়গা ডুবে যাবে। আবার অনেক জায়গা মরুভূমিতে পরিণত হবে। ভূমির ক্ষয় বৃদ্ধি পাবে। মাটির উর্বরতা শক্তি কমে যাবে। গতানুগতিক ধান চাষের কারণে বাতাসে মিথেনের পরিমাণ বেড়ে যাবে। কার্বন-ডাই-অক্সাইডের চেয়ে মিথেনের পরিমাণ কম হলেও ওয়ার্মিংএ এর ভূমিকা প্রায় তের গুণ বেশি। তাই মিথেনের উৎস পেঁকি জমির ধান চাষে (Lowland rice cultivation) পরিবর্তন আনতে হবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

সাথে সাথে ধান বিজ্ঞানীদের যার যার 'হাতের কাজ' নিয়েও কিছুটা বিভ্রান্তি শুরু হয়ে যায়।। মাটি থেকে প্রচুর খাবার টেনে নেয় বলে *নিউ প্ল্যান্ট টাইপ* মাঠে যাবে কি যাবে না এখন তর্কের বিষয়। ভিটামিন রাইচ এর গবেষণা এখন জি-এম ফুড-বিতর্কের মোড়কে কিছুটা চুপচাপ আছে। তবে পীড়ণ-প্রতিরোধী গবেষণা কার্যক্রম কিছু জোরদার হয়েছে বলে মনে হয়। চুবানি-সহনশীল (Submergence tolerant) এবং লবণ প্রতিরোধী (Salinity tolerant) জাতের নির্দিষ্ট ক্রোমোসমে চুবানি এবং লবণ সহনশীল কাঙ্খিত *বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপক জিন বা জিন সমষ্টি* যথাক্রমে (QTL:

Quantitative Trait Locii; *Sub 1* এবং *Saltol* এর অবস্থান সঠিক ভাবে সনাক্ত করা গেছে। সাথে সাথে Marker assisted back crossing প্রক্রিয়ায় জাত উন্নয়নের কাজও এগিয়ে যেতে থাকে। বেশ আগে খরা নিয়ে কিছু কাজ হলেও মাঝ খানে তা স্তিমিত ছিল। কিন্তু *বিল এন্ড মিলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন* সাহায্যের হাত বাড়ানোতে এশিয়া এবং আফ্রিকার খরা-পীড়িত ধান গবেষণায় প্রাণ সঞ্চারের সম্ভাবনা দেখা দেয় আবার। শেষের এই কার্যক্রমটি আরও বেগবান হতে পারতো যদি নাকি ড. ল্যাম্পের ঐ বর্ষজীবী মুড়ি ধানের কার্যক্রমটি এতদিনও জিন্দা থাকতো।

কেমন হওয়ার কথা ছিল এই বর্ষজীবী ধান? একবার লাগাবার পর আর বার লাগানোর দরকার হতো না। কেটে নেওয়ার পর মুড়ি থেকে আবার ধানগাছ গজাতো। ধান হতো। তারপর আবার কেটে নেওয়া এবং মুড়িধান মানে *চক্রবৎ পরিক্রমণে* অবস্থা। এদের শিকড় বছরে বছরে গভীর থেকে গভীরে যেত। মাটির গভীর থেকে পানি শুষে আনতো বলে পানির দরকার হতো কম। পানির এই টানাটানির যুগে এটা হতো উপরি পাওনা। মাটিকে চাপড়া ঘাসের মত ঢেকে রেখে ভুমিক্ষয় থেকে মাটিকে আগলে রাখতো। এখন যেখানে সেচ প্রকৌশলীরা Alternate wetting and drying বলে পানির পরিমিত ব্যবহারের জন্য বিকল্প সেচ ব্যবস্থার কথা ভাবছেন, কেন যেন মনে হয় ড. ল্যাম্পের কথা মনে রাখলে তারা আরও পানির সাশ্রয় করতে পারতেন। অবশ্য দায়িত্ব ছিল ফসল বিজ্ঞানীদের আগে। তারা যদি মিলে-মিশে কয়েক বছর খাটা-খাটুনি করে একটা বর্ষজীবী জাত বের করে দিতে পারতেন, তাহলে প্রকৌশলীরা পানির ব্যপারে একটা ভালোমত সুরাহা করতে পারতেন। ড. ল্যাম্পে যে বর্ষজীবী ধানের স্বপ্ন দেখেছিলেন সেটা ছিল ধানের মুড়ি বা ডেমি বা গোড়া থেকে কুশি হওয়ার প্রবণতা কে নিয়ে। যাহোক তাঁর স্বপ্ন দেখার আগে এবং পরে এই মুড়ি হওয়া নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কাজ হয়েছে। মোটামুটি এগুলোর উপর ভিত্তি করেই ভারতের বাঙ্গালরুতে ওয়ার্কসপ হয় ১৯৮৬ সালে। মুড়ি ধানের ভালোমন্দ নানা বিষয়ই আলোচিত হয়। ভারতের কর্নাটকে মুড়ি ফসলে ভালো ফলন পাওয়া গেছে বলে জানা যায়। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এই ব্যাপারে একটি পেপার উপস্থাপন করে। তাতে সম্ভাবনার কথা কিছু কথা ছিল। কিন্তু মুড়িকে নিয়ে ব্যতিক্রধর্মী কিছু করা যায় তা কারো পক্ষ থেকে উচ্চারিত হয়নি। অতএব ওয়ার্কশপের চূড়ান্ত আলোচনায় কিছুটা হতাশাই ব্যক্ত হয়। মুড়ি-পদ্ধতিতে কিছুটা ফসল হয় বটে। কারো মতে শুধুমাত্র Scientific interest । কারো মতে শুধু তা কেন হবে? Potentiality থাকলে তা বের করতে হবে। তবে সবাই একমত ছিল যে উঁচু জমিতেই মুড়ি ফসল করা সম্ভব। এবং তা একটা অতিরিক্ত এবং Chanch-crop হিসেবেই হয়তো করা যাবে। তাছাড়া রোগবালাই ও পোকামাকড়ের অন্তর্বর্তীকালীন আশ্রয়স্থল হওয়ার সম্ভাবনা। বাংলাদেশ বা পূর্ব ভারতের জন্য বোরো-রোপা আমন শস্যক্রমে আমন ফসল ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ফলে পরবর্তী বোরোও ক্ষতির সামনাসামনি হওয়া স্বাভাবিক। যে ফলন পাওয়া যাবে তাতে সাধারণ চাষির আদৌ কোনো কাজে আসবে কিনা। অতএব কিছুটা সম্ভাবনা থাকলেও এতটা চিন্তা-ভাবনা করে কোনো গবেষণা প্রতিষ্ঠান মুড়ি-পদ্ধতিকে এগিয়ে নেওয়ার সদিচ্ছা প্রকাশ করেনি।

তবে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিটের দু'একজন গবেষক এবিষয়ে কিছু কাজ করেছিলেন বলে আমরা জানি। IRRI 'র Multiple cropping division এর একজন গবেষণা সহকারী Alfredo N. Calendacion Sr. (মি. ক্যালেন্ডাসিয়ন) এবং তাঁর উর্ধ্বতন বিজ্ঞানী Dr. D. P. Garrity (ড. গ্যারিটি) 'র নাম করা যায়। ক্যালেন্ডাসিয়ন ফিলিপিনের গ্রাম অঞ্চল থেকে হঠাৎই ধানের কুশি সংক্রান্ত এক অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করে বসেন। তাঁরা এই পদ্ধতির নাম দেন লক-লজিং (Lock lodging) পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ধান কাটার পর পাশাপাশি দু'সারি নাড়া গোড়ায় চাপ দিয়ে বেনি (Braided) ভাঙিয়ে রাখা। এভাবে বেনি ভাঙানো নাড়ার গোড়া থেকে শক্ত সামর্থ্য মুড়ি বের হয় যা সাধারণ লিকলিকে মুড়ি থেকে ভিন্ন। ফিলিপিনোরা আগা-মেরে (গাছের উপর থেকে ধান কাটা) ধান কাটে। ফলে সহজেই এই বেনি বানানো যায়। ক্যালেন্ডাসিয়নের ভাষায় গ্রামের কোনো এক খেয়ালি মেয়ে এই পদ্ধতির গোড়া পত্তন করে। এই পদ্ধতিতে কেন ভালো মুড়ি-ফসল হয় সে কারণও তাঁরা বের করলেন। তবে সব জাতের বেলায় এমনটি ঘটে না। যে সমস্ত জাতের মধ্যে ধান কাটার পর কার্বোহাইডেটের অবশেষ বেশি পরিাণে থাকে তাদের মুড়ি উৎপাদন ক্ষমতা বেশি। তাপমাত্রা একটু কম হলে ভালো হয়। গোড়া থেঁতলে যাওয়ার কারণে নাড়ার একেবারে গোড়া থেকে শক্ত-সামর্থ্য মুড়ি বের হয়। নাড়ার উপর থেকে যে সমস্ত মুড়ি বের হয় সেগুলো লিকলিকে এবং দুর্বল। দুর্বল মুড়ি থেকে ভলো ফলন পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। লক-লজিং পদ্ধতিতে লিকলিকে মুড়ি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। প্রধান ফসলের পর লক-লজিং করে আরেকটি ফসল ঘরে আনতে ৭৫-৮০ দিন সময় লাগে। আর ফলন, প্রধান ফসলের কাছাকছি।

বাংলদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে সাধারণ মুড়ি পদ্ধতি বা লক লজিং পদ্ধতি নিয়ে সামান্য কিছু কাজ হয়েছিল। কিন্তু সীমাবদ্ধতা হলো বোরোতে করলে পরবর্তীতে পানি এসে ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা। আবার যদি রোপা আমনের পরে করা হয় তাহলে ঠান্ডায় ধান ফুলে বের হতে পারবে না। একমাত্র সম্ভাবনা ছিল যেখানে বন্যার ভয় নেই। এমন জায়গায় বোরোর পরে রোপা আমন করা হয়। আউশ করলে ভালোমত রোপা আমনের জন্য যে সময় থাকার কথা তা থাকে না। তাই ধানের মুড়ি প্রযুক্তির সম্ভাবনা থাকলেও কোথায় করা হবে এগুলোর কোনো সমাধান ছিল না। একারণেই নিকট অতীতে কেউ আর এই প্রযুক্তি নিয়ে তেমন কিছু করার চেষ্টা করেননি।

জনাব মৃন্ময় গুহ নিয়োগীর বিশেষত্ব হলো তিনি এই পদ্ধতিকে কিছুটা অভিনবভাবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি কুশি ভেঙে নিয়ে আবার তা জমিতে লাগিয়েছেন। তিনি একে *কুশি ধান উৎপাদন প্রযুক্তি* বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর আর একটি বিশেষত্ব হলো তিনি এটাকে মঙ্গা মোকাবিলার হাতিয়ার হিসেবে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। মঙ্গা জনাব নিয়োগীর প্রিয় বিষয়। ২০০৩ এ মঙ্গা নিয়ে তার প্রথম কার্যক্রম শুরু হয়। একাজে তিনি ব্রি উদ্ভাবিত ব্রি ধান৩৩ কে নিয়ে মাঠে নামেন। পরে ব্রি-রংপুরের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. এম এ মজিদও মঙ্গা নিয়ে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেন। জনাব নিয়োগীর ভাষায়, গরীব চাষীরা বোরো ধান ঘরে ধরে রাখতে পারে না। ঋণ পরিশোধ বা সংসারের প্রয়োজনেই বিক্রী করে ফেলে। খাওয়ার ধানও ঘরে থাকে না। একজন চাষির জন্য এই অবস্থা যথেষ্ট বিব্রতকর। কুশি ধান করতে পারলে অসময়ে কিছু ধান তার ঘরে আসার সম্ভাবনা থাকে।

তার এই প্রযুক্তিকেও শুধুমাত্র বর্ষায় ডুবে যাবে না এমন জমির জন্যই সুপারিশ করা হয়েছে। সাধারণত মে মাসের মাঝামাঝি একজন চাষি তার বোরো ধান কেটে ঘরে তুলে। জুলাইয়ের শেষ অবধি আমন লাগানোর আগ পর্যন্ত জমি খালি থাকে। বোরোধান কেটে নেওয়ার পর ধানের গোড়া থেকে গজানো কুশি যদি এই খালি জমিতে লাগিয়ে ঠিক মতো পরিচর্যা করা হয় তবে ৭৫-৮০ দিনের মধ্যে একটি ফসল পাওয়া যেতে পারে। এরপর স্বল্প জীবনকাল বিশিষ্ট বা আলোক সংবেদী কোনো জাত চাষ করে রোপা আমন হিসেবে আরেকটি ফসল পাওয়া যায়। এটাই হলো কুশি প্রযুক্তির সার সংক্ষেপ।

জনাব নিয়োগী তার প্রযুক্তিতে হাইব্রিড ধান ব্যবহার করছেন। একটা যুক্তি থাকতে পারে। হাইব্রিড ধানের শিকড়ের বাড়-বাড়তি সাধারণ উফশীর চেয়ে ভালো। এজন্যই সম্ভবত কুশি উৎপাদনে কিছু বাড়তি সুবিধা পাওয়া যেতে পারে। ব্রি-রংপুরের বর্তমান ইনচার্জ তাঁর রাজশাহীতে কর্মকালীন এমনি ধরনের কুশি বিষয়ক কিছু পরীক্ষা-নীরিক্ষা করেছেলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল হাইব্রিড-বীজের বিকল্প হিসেবে কুশির ব্যবহার করা। তিনি সম্ভবত গাছের বৃদ্ধি পর্যায়ের প্রথম দিকের কিছু বর্ধিষ্ণু কুশি আলাদা করে নিয়ে ভিন্ন জমিতে লাগিয়ে অল্প বীজ দিয়ে হাইব্রিডের আবাদি আওতা বাড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন। এখানে আবাদি জমি বাড়ছে কিন্তু জমি প্রতি মোট ফলন বাড়ছে না। কিন্তু নিয়োগীর বেলায় যথারীতি বোরো করা হচ্ছে। ধান কাটার পর উদ্ভূত কুশি দিয়ে এই জমি লাগিয়ে অল্প সময়ে অতিরিক্ত ধান পাওয়া যাচ্ছে। অর্থাৎ জমি প্রতি ফলন বাড়ছে।

তবে এই প্রযুক্তির কিছু দুর্বল দিকও ভেবে দেখা দরকার। প্রযুক্তিটি হাইব্রিড ধানকে ভিত্তি করে করা হযেছে। যে কোনো ডেমি ধান রোগ বালাই-পোকামাকড়ের বেলায় দুর্বল। হাইব্রিড ধানও সাধারণ রোগ বালাই এবং পোকামাকড়ের ব্যাপারে একই রকম দুর্বল। এই কুশি ধানের সময় অনেকটাই আউশের সময়। এ সময় তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা কিছুটা বেশি থাকে। আকাশ মেঘলা থাকে। ফলে এই সময় রোগবালাই পোকা-মাকড়ের উপদ্রব বেশি হতে পারে। হাইব্রিড-এর প্রধান ফসলই এই পরিবেশে একে বারেই দুর্বল। সেখানে হাইব্রিডের কুশি কতখানি চলনসই হতে পারে তা সত্যি ভেবে দেখার ব্যাপার। তবে জনাব নিয়োগী এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে বলেছেন। তিনি বলেছেন এই প্রযুক্তি প্রথম বছর করলে পরের বছর বিরতি দিয়ে ফসল চক্রে পরিবর্তন আনতে হবে। নইলে রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের কারণে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা।

জনাব নিয়োগীর কোনো প্রথাগত ল্যাবরেটরী নেই। তাঁর ল্যাবরেটরি হলো রংপুর দিনাজপুরের প্রত্যন্ত এলাকার গরীব চাষিদের মাঠ। তারাই তাঁর গবেষণার গিনিপিগ। এই প্রযুক্তির পরিমার্জন এবং পরিবর্ধন হয়েছে মাঠে। নিয়োগীর ভাষায় ইতোমধ্যেই তা মাঠ পর্যায়ে ছড়িয়ে যাওয়ার ব্যপক সম্ভাবনা। তবে পেশাগত গবেষক ফরপহপয আমার কিছু বলার আছে। আমি মনে করি, প্রযুক্তির সম্প্রসারণের আগেই আরও কিছু নিবিড় পরীক্ষা-নিরীক্ষা হওয়া দরকার, আরও কিছু সময় নেওয়া দরকার। এখানে নিয়োগীর আবিষ্কারকে কোনোভাবেই ছোট করে দেখা হচ্ছে না। বরঞ্চ তাঁকে সাহায্য করা উচিৎ। এজন্য তাঁর সাথে জাতীয় কোনো গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যায়ের যুগোলবন্দী হলে ভালো হয়।

cv`wUKv: লেখাটি শেষ করে আনবার পর ফিলিপিন থেকে প্রকাশিত প্রত্রিকার প্রবন্ধে দেখলাম মুড়ি ধানের সম্ভানা নিয়ে অনেক কথা লেখা হয়েছে। মি. ক্যালেন্ডাসিয়ন এখন ফিলিপিন সরকারের সাথে লক-লজিং বিষয়ে পরামর্শক হিসেবে কাজ করছেন। পত্রিকায় তাঁর প্রবর্তিত পদ্ধতির ভূয়ষী প্রশংসা দেখলাম। পাকিস্ত্মানের Dawn পত্রিকায়ও একই ধরনের প্রবন্ধ আমার নজরে আসলো। তবে সেটা গতানুগতি মুড়ি পদ্ধতি নিয়ে।

‡Møvevj Iqvwgs Ges wbevPbx ‡gwb‡d‡÷v

A‡±vei 18, 2008, ˜wbK msev˜

দেশে জাতীয় ও উপজেলা নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হয়েছে। উপজেলা নির্বাচনের সময়সূচি নিয়ে সরকারের সাথে রাজনৈতিক দলগুলোর মতান্তর চলছে। কিন্তু কোনো প্রকার অকাট্য যুক্তিতর্কের মধ্যে না পড়লে জাতীয় নির্বাচন হবে বলে আমার বিশ্বাস। তবে জরুরী অবস্থা থাকায় মাঠে-ময়দানে যে নির্বাচনী উত্তাপ আশা করা গেছিলো তা এখনও দেখা যায়নি। সরকার বলেছেন জরুরী অবস্থা শিথিল করা হবে কিন্তু একেবারে তুলে নেওয়া ঠিক হবে না। এদিকে দেশে-বিদেশের যে খবর তাতে জরুরী অবস্থার পক্ষে তেমন কোনো সমর্থন নেই। যাহোক নির্বাচনী হাওয়া ঠিকই একসময় গরম হয়ে উঠবে। বাইরে আমরা যাই দেখি না কেন, ভিতরে ভিতরে সব দলেরই নির্বাচনের প্রস্তুতি চলছে। নির্বাচনী বৈতরণি পারের জন্য কেউ জোট বা মহা মহাজোট বাধার চেষ্টা করছেন। সবদলেরই একটা আঁতেল সম্প্রদায় থাকেন। নিশ্চয়ই তারা এই মূহুর্তে একটি ব্যতিক্রমধর্মী নির্বাচনী মেনিফেস্টোও তৈরি করতে ব্যস্ত। নির্বাচিত হলে জনগণের জন্য অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের জন্য কে কতখানি সহজ সুযোগ তৈরি করে দিতে পারবেন সে সব কথা থাকবে এই মেনিফেস্টোগুলোতে। আশা করছি এবারের মেনিফেস্টোতে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ, খাদ্যনিরাপত্তা বৃদ্ধি, কৃষিতে প্রতিয়োগিতামূলক ভর্তুকি প্রদান, কৃষির ইনপুটসমূহ সহজলভ্যকরা, কৃষকদের ব্যাঙ্ক ঋণসংক্রান্ত জটিলতা দূর করা, সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা, দুর্নীতির বিরূদ্ধে বিশেষ জেহাদ ঘোষণা, শান্তি-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, সন্ত্রাসদমন, অর্থনৈতিক সংস্কার, আয়কর ও ভ্যাট সম্পর্কে আকর্ষণীয় প্যাকেজ ঘোষণা, বিদেশে পাচারকৃত অর্থ উদ্ধারের প্রচেষ্টা, পোশাক-শ্রমিকদের নিয়ে নতুন কিছু ভাবনা ইত্যাদি ব্যাপারে অনেক প্রস্তাবনা থাকবে। পররাষ্ট্র বিষয়ে, প্রতিবেশীদের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখা, ইসলামি সংহতি জোরদারকরণ, বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ, বিদেশে নিরাপদ কর্মসংস্থানের সুযোগ, জাতিসংঘে শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশের আরও বেশি ভূমিকা রাখা, সন্ত্রাসদমনে কার্যকরী ভূমিকা পালন, সার্ককে আরও কার্যকরী ভূমিকা রাখতে উদ্যোগী কার্যক্রম গড়ে তোলা ইত্যাদি বিষয়ে চমকপ্রদ সব বক্তব্য থাকবে। এগুলো অবশ্যই জরুরী। তবে শেষ কথা নয়। মেনিফেস্টোতে আরও বেশি বৈচিত্র্য আনতে হবে। শুধু নির্বাচনী ওয়ার্মিং নয় গেলাবাল ওয়ার্মিংএর বিষয়ও থাকতে হবে। রাজনীতিবিদদেরকে বুঝতে হবে নিকট ভবিষ্যতে গেলাবাল ওয়ার্মিংএর সমস্যা আমাদের সামনে ভয়ানক হয়ে দেখা দিচ্ছে। সত্যিকারের দেশ প্রেমিক হলে নিজেদের পরবর্তী প্রজন্মের কথা সবাই মাথায় রাখবেন। দেশ চালাতে রাজনীতিবিদদের কোনো বিকল্প নেই। তারাই জনগনকে বুঝাতে পারেন ভালো। তাই নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় গেলাবাল ওয়ার্মিং তথা পরিবেশ ভাবনা একটা বিষয় হলে সবার জন্য মঙ্গল।

অতএব এব্যাপারে কিছুটা আলোকপাত করার দরকার আছে বলে মনে করি। সচেতন ব্যাক্তিমাত্রই জানেন যে, সেই জেমস্ ওয়াটের স্টিম ইঞ্জিন থেকে জাম্বু জেট বা আজকের সস্তায় বিক্রীর জন্য নির্মিতব্য ন্যানোকার, আরামপ্রদ ঘরোয়া জীবনের জন্য নানান কিসিমের সুযোগ-সুবিধে সবইতো কার্বন ভিত্তিক ইন্ধনের উপর নির্ভরশীল। এই কার্বন আসছে কয়লা এবং হাইড্রোকার্বন (পেট্রোল-ডিজেল-গ্যাস ইত্যাদি) থেকে। আজকের সভ্যতাকে সচল রাখার জন্য এগুলো প্রতিনিয়ত পুড়ছে। অতঃপর বাতাসে জমা হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড ইত্যাদি হিসেবে। কৃষি কাজের সাথে সাথে বাতাসে মিথেন এবং নাইট্রাস অক্সাইড-এর পরিমাণও বেড়ে যাচ্ছে। আমাদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে (ফ্রিজ, এসি, সুগন্ধি স্প্রে) সিএফসি (আজকাল অবশ্য সিএফসি-ফ্রি ফ্রিজ-এবং শীতায়ন যন্ত্রপাতি বাজারে বহুল প্রচলিত) বলে একধরনের গ্যাস ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যার অবধারিত পরিণতি বাতাসে মিশে যাওয়া। সার্বিকভাবে পৃথিবীর তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি করে দিচ্ছে এই সব গ্যাস গুলো। এভাবে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া হলো গ্রিন হাউজ এফেক্ট এবং এই প্রক্রিয়ায় জড়িত গ্যাসগুলো গ্রীন হাউজ গ্যাস বলে পরিচিত। শীতের দেশে সত্যিকারের গ্রীন হাউজের মধ্যে শাক সবজি জন্মানো হয়। সেখানে কৃত্রিম উপায়ে বাইরের থেকে তাপমাত্রা কিছুটা বেশি রাখা হয়। বা আপতিত সূর্যরশ্মি গ্রীন হাউজের ভিতরে পড়ে তা শর্ট ওয়েব (Short wave) থেকে লং ওয়েব (Long wave) রেডিয়েশনে পরিণত হওয়ার কারণে গ্রীণ হাউজের তাপমাত্রা কিছুটা

বেড়ে যায়। এই প্রপঞ্চকে মাথায় রেখে পৃথিবীর গরম হওয়াকে গ্রীন হাউজ এফেক্ট বলা হয়েছে। প্রকৃতিতে জমা হওয়া কার্বন ডাই অক্সাইডের তুলনায় মিথেন এবং সিএফসির পরিমাণ পরিবেশে বেশ কম হলেও তাপবৃদ্ধির ক্ষমতা অনেক বেশি। তবে প্রকৃতিতে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ অন্যান্য গ্যাস থেকে বেশি। তাই বিজ্ঞানীদের ধারনা, অন্যান্য গ্যাস সবাই মিলে যে পরিমাণ তাপ বাড়ায়, কার্বন ডাই অক্সাইড একাই তাই করে থাকে।

যে সমস্ড় গ্যাসকে গ্রীন হাউস এফেক্ট বা উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য দায়ী বলে বদনাম দেয়া হলো, তাদের থেকেও বেশি বদনামের ভাগী করা যায় জলীয় বাষ্পকে। অথচ জলীয় বাষ্পকে এভাবে দেখা হয় বলে মনে হয় না। আদতে পৃথিবীর উপরিভাগের গড় তাপমাত্রা হওয়ার কথা ছিল শূন্যের ১৯ ডিগ্রী সেলসিয়াস নিচে (-১৯সে)। কিন্তু তা না হয়ে পৃথিবীর উপরি তলের গড় তাপমাত্রা হলো ১৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস। এর অন্যতম নিয়ামক হলো জলীয় বাষ্প। অতিরিক্ত ঠান্ডা থাকলে হয়তো আজকের যে জীববৈচিত্র্য সেটা আমরা পেতাম না। এমনওতো বলা যায় গ্রীনহাউস ইফেক্ট ছাড়া বোধ হয় আজকের যে gvbl তা সৃষ্টি হতো না। অতএব জলীয় বাষ্পের কারণে যে গ্রীনহাউস ইফেক্ট তা আমাদের জন্য আশীর্বাদ ছিল। কিন্তু এখন গ্রীনহাউস এফেক্ট বলতে পৃথিবীর অনাকাঙ্খিত গরম হওয়া বুঝায়। এই অবস্থাকে আরও বিশেষায়িত করে গেলাবাল ওয়ার্মিং বলে অভিহিত করা হচ্ছে। যাহোক এখনও যে জলীয় বাষ্পের কারণে পৃথিবীর গরম হওয়া বন্ধ আছে তা কিন্তু নয়।

জাতিসঙ্ঘের Intergovernmental pannel on Climate Change (IPCC) এর ২০০১ এ প্রকাশিত তৃতীয় অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্টে বলা হয়, গেলাবাল ওয়ার্মিংএর অন্যতম কারণ বিগত ৫০ বছরের মানুষের হস্ড়ক্ষেপ। যার কিছুটা বর্ণনা আগেই দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ ৩৭০ পিপিএম। এভাবে চলতে থাকলে ২১০০ সালে তা দাঁড়াবে ৫৪০ থেকে ৯৭০পিপিএম পর্যন্ড়। প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৯৯০ থেকে ২১০০ পর্যন্ড় তাপমাত্রা বাড়বে ১.৪ থেকে ৫.৮ সে। সাগরের উচ্চতা বাড়ার কথা বলা হয়েছে ৯ থেকে ৮৮ সেমি। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে ইতোমধ্যেই বেশ কিছু ভৌতিক ও জীববৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। IPCC এর চতুর্থ প্রতিবেদন অনুসারে চলতি শতাব্দীতে কৃষিসহ যে সব পরিবর্তনের আশংকা আছে তা দৈনিক সংবাদের (৩০ আগস্ট, ২০০৮) এই কলামে আমি কিছু কিছু বর্ণনা করেছি। উপাত্তগত সামান্য হের ফের থাকলেও প্রকৃত পক্ষে দুই প্রতিবেদনের মূল বিষয়বস্তু ও লক্ষ্য একই। এই সমস্ড় প্রতিবেদনে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোই প্রাথমিক ভাবে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হবে বলে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের আলামত পেয়ে বিজ্ঞানীরা বসে থাকেননি। ১৯৭৯ তে World Meteorological Organization (WMO) প্রথম বিশ্ব জলবায়ু-কনফারেন্সের আয়োজন করে। ফলশ্রুতিতে ১৯৮৮ সালে United Nations Environment Programme (UNEP) একসাথে IPCC গঠন করে। ২০০৭ সালে এই সংস্থা তার কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়। এছাড়াও WMO উক্ত কনফারেন্স International Council of Science (ICSU) এবং ইউনেস্কোর Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) এর সাথে World Climate Research Programme (WCRP) গ্রহণ করে। অতঃপর ১৯৯০ সালে দ্বিতীয় বিশ্ব জলবায়ু-কনফারেন্স হয়। যেখানে মানুষের হস্ড়ক্ষেপের কারণে জলবায়ুর জন্য হুমকি কারণ হতে পারে এমন মাত্রার গ্রীণ হাউস গ্যাস উদ্গীরণ কমিয়ে ফেলা বা সীমিত করার লক্ষ্যে United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) গঠন করা হয়। তৃতীয় বিশ্ব জলবায়ু-কনফারেন্স হওয়ার কথা জেনেভাতে ২০০৯ এ। এভাইে গেলাবাল ওয়ার্মিং প্রশমনে WMO তার ভূমিকা রাখছে। IPCC এর প্রতিবেদন অনুসারে উন্নয়নকামী দেশগুলো বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়া জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রথম ধাপেই ক্ষতির মুখোমুখি হবে বলে আগেই বলেছি। অতএব এই অঞ্চলের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিজ্ঞানীদেরকে সম্ভাব্য গেলাবাল ওয়ার্মিং-এর হাত থেকে বাঁচার জন্য উপায় উদ্ভাবন করতে হবে। এব্যাপারে দক্ষিণ এশিয়ার সংশিষ্ট ক্ষেত্রের বিজ্ঞানীরা যাতে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে সে জন্যই গত ২৫-৩০ আগস্ট ২০০৮ ঢাকায় Climate Change and Food Security in South Asia শীর্ষক একটি সিম্পেজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়। WMO, FAO, UN Economic and Social Commission for Asia and Pacific (UNESCAP), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ সরকার এবং ওহাইও স্টেট ইউনিভার্সিটি, আমেরিকা যৌথভাবে উক্ত অনুষ্ঠান স্পনসর করে। উক্ত সিম্পোজিয়ামে ১৭ দেশের ২৫০ জন বিষয় বিশেষজ্ঞ অংশ গ্রহণ করে। এর মধ্যে ছিল আবহাওয়াবিদ, সাগরতত্ত্ববিদ, মৃত্তিকাবিজ্ঞানী, কৃষিবিজ্ঞানী, জীববিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, দুর্যোগব্যবস্থাপনায়

বিশেষজ্ঞ, জৈব প্রযুক্তিবিদ, অ্যাস্ট্রনমিস্ট, হিমবাহবিশারদ, রসায়নবিদ, বিশেষজ্ঞ প্রযুক্তিবিদ, চিকিৎসক, ভূগোলবিদ, পরিবেশ বিশারদ, পানি বিশেষজ্ঞ প্রভৃতি। দক্ষিণ এশিয়া কৃষি প্রধান অঞ্চল। এখানে জমি বিহীন, সামান্য জমির মালিক, কোনোরকমে বেঁচেবর্তে থাকা, ঋণগ্রস্থ কৃষকের সংখ্যাই বেশি। কৃষি জমির পরিমাণ সীমিত। একই জমিতে বছরে কয়েকবার ফসল ফলাতে হয়। জমির জৈব পদার্থের পরিমাণ কম। উর্বরতা শক্তি ধরে রাখা কঠিন। পক্ষান্তরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বনাঞ্চল কমে যাচ্ছে। এজন্য যিনি যাই উপস্থাপন করুন না কেন সবার উপস্থাপনার সারমর্ম দাঁড়ায় গ্লোবাল ওয়ার্মিং এবং কৃষি। কৃষি আমাদের বেঁচে থাকার প্রথম এবং একমাত্র অবলম্বন। জলবায়ু সেখানে অন্যতম নেয়ামক। জলবায়ু কৃষিকে প্রভাবিত করে, কৃষিও জলবায়ুকে প্রভাবিত করে। সিম্পোজিয়ামে সবাই অনুভব করেন যে বেঁচে থাকার জন্য যা দরকার তা হলো ওয়ার্মিং এর কারণ যে গ্যাসগুলো তা নিয়ন্ত্রণ করা (কিয়োটো প্রটোকল ঠিক ঠিক মেনে চলা) এবং আক্রান্ত অঞ্চলের মানুষগুলো যেন পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে চলতে পারে সেই ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা। গ্লোবাল ওয়ার্মিং প্রশমনে কৃষি একটা বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে বলেও সবাই মনে করে। যাহোক বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক আলোচনার পর সিম্পোজিয়ামে সর্বসম্মতিক্রমে দক্ষিণ এশিয়ার জন্য কিছু সুপারিশমালা গৃহীত হয়। সেগুলো হলোঃ

- Climate Change and Food Security in South Asia Network (CCFSSANet) এবং South Asia Climate Outlook Forum (SACOF) গঠন করা।
- দক্ষিণ এশিয়ায় জলবায়ু পরিবর্তন এবং খাদ্য নিরাপত্তার ব্যাপারে বহুমুখী গবেষণাকে উৎসাহিত করা, বিভিন্ন প্রতিবেশে কার্বন জৈবীকরণ, যথাযথ প্রশমন এবং অভিযোজন পদ্ধতি বের করা।
- বিভিন্ন শিক্ষা এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে এ ব্যাপারে সহযোগিতা সম্প্রসারণ এবং জোরদার করে প্রযোজ্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলোর মান ও মানব সম্পদ উন্নয়ন সহায়তা করা।
- পরিবর্তিত জলবায়ুর সাথে অভিযোজনের খাতিরে প্রযুক্তিগত এবং আর্থনীতিক সহায়তা দরকার। এজন্য অর্থসংস্থানের পরিকাঠামো গড়ে তোলা।
- কার্বন ট্রেডিং এর মতো ইকোসিসটেম সার্ভিস এর জন্য প্রশমনকারী ও অভিযোজনকারীদেরকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করা। (যেমন উন্নত বিশ্ব হয়তো বেশি কার্বন উদ্গীরণ করছে। এতে সবারই ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু উন্নয়নশীল বিশ্ব কম কার্বন উদ্গীরণ করছে। বা বনভূমি সৃষ্টি বা উদ্ভাবিত কোনোপ্রকার প্রায়োগিক কৃষি-কৌশলের মাধ্যমে উদ্গীরিত কার্বন কমাতে ভূমিকা রাখার কারণে উন্নয়নশীল বিশ্বকে বিধিমাফিক ক্ষতিপূরণ-অর্থ প্রদান করতে হবে; এটাই কার্বন ট্রেডিং)।
- অঞ্চলভিত্তিক অভিযোজন এবং প্রশমন পদ্ধতি অনুশীলনের জন্য আঞ্চলিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং নীতিনির্ধারণী কৌশলসমূহ প্রবর্তনে সহায়তা এবং জোরদার করা।

এই সুপারিশগুলো ঢাকা ঘোষণা নামে অভিহিত করা হয়। এই সিম্পোজিয়াম থেকে উন্নয়ন সহগামী এবং বেসরকারী সংস্থার কাছে অর্থ প্রদানের আবেদন করা হয়। যাতে করে উক্ত ঘোষণার সুপরিশমালা যথাযথ ভাবে কাজে পরিণত করা যায়।

এই সিম্পোজিয়ামের বিশেষ দিক হলো দুজন মহামান্য রাষ্ট্রপতি (বাংলাদেশ এবং আইসল্যান্ড) যোগ দিয়েছেন। সমাপনী অধিবেশনে আমাদের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা উপস্থিত ছিলেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ড. ইয়াজ উদ্দিন আহমেদ একজন মৃত্তিকা বিজ্ঞানী। লবণাক্ত মাটি এবং ধান নিয়ে তিনি যথেষ্ট কাজ করেছেন। এই অনুষ্ঠান বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হওয়ার পিছনে তাঁর অনন্য ভূমিকার কথা ওহাইও স্টেট ইউনিভার্সিটির মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর রতন লালের বক্তৃতা থেকে আমরা জেনেছি। প্রফেসর লাল কার্বন ব্যবস্থাপনা এবং সংরক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালক এবং এই সেমিনারের মুখ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আমরা বুঝতে পেরেছি গ্লোবাল ওয়ার্মিংএর কারণে সবচেয়ে বেশি হুমকির মুখে বাংলাদেশ। আর আইস লান্ড! বরফের দেশ। বরফ গললেতো তাদের তো ভালো হওয়ার কথা। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারটি তার উল্টো। মেরুর বরফ-গলার সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে সেখানকার বিজ্ঞানীরা হাজির হয়েছিলেন। ঐ দেশের মহামান্য প্রেসিডেন্ট ড. Ólafur Ragnar Grímsson এই সিম্পজিয়ামে মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন। তাঁর বক্তব্যে যেমন ছিল বিজ্ঞান তেমনই ছিল রাজনীতি। তিনি বলেছেন, আইসল্যান্ড এবং বাংলাদেশ পৃথিবীর দুই প্রান্তের দুটো দেশ হলেও তাদের ভাগ্য একই সূত্রে গাঁথা। সেখানে বরফ গলতে থাকলে বাংলাদেশের অনেক এলাকা ডুবে যাবে। বরফ গললে তাদেরও ভূমি সংরক্ষণ ও জীব বৈচিত্র্যে ব্যপক পরিবর্তন আসবে যা কখনওই কাম্য না। তিনি মেরুর হিমবাহ রক্ষার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। তার প্রচেষ্টায় মেরুর কাছাকাছি দেশসমূহ নিয়ে একটা ফোরাম (Arctic forum) চালু আছে। তিনি হিমালয়কে কেন্দ্র করে

এমন একটি ফোরাম গড়ে তোলার পরামর্শ দিয়েছেন। হিমালয়কে তিনি এতদ্অঞ্চলের (সন্নিহিত চীন সহ) Water tower বলে আখ্যায়িত করেছেন। আমার কাছে মনে হয়েছে এই একটি কথাই যেন একটি অসম্ভব সুন্দর কবিতা, কিংবা সুন্দর রাজনীতি বা বিজ্ঞান। তাঁর দেশে নিশ্চয়ই তিনি জনপ্রিয়। তা না হলে আইসল্যান্ডের সাগর পাড়ের একটি জেলে পল্লী থেকে উঠে এসে তিন টার্ম (এক টার্ম = ৪ বছর) ধরে সে দেশের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেছেন বার বছর অনেক সময়, এর পর আর না। এই দীর্ঘ সময় তিনি যে নেতৃত্বে আছেন তার গুঢ় রহস্য কী। তিনি তার ভাষণে বলেছেন তার জীবনের শুরুতে তিনি জেলেদের মাছের ট্রলারে কয়লা সরবরাহ করতেন। সেখান থেকেই বোধ হয় তাঁর মধ্যে পরিবেশ ভাবনা এবং Clean energy 'র ধারনা আসে। যেখানে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর ঝুঁকি কম থাকে। আজ আইসল্যান্ড সহ সব পরিবেশবাদীরাতো এই কথাটিই ভাবছেন। জনপ্রিয় ঐ প্রেসিডেন্ট তিন-তিনবার নির্বাচন করেছেন। আমার বিশ্বাস তাঁর নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে নিশ্চয়ই গ্লোবাল ওয়ার্মিং তথা পরিবেশের কথা ছিল। এজন্যই আমি ভাছিলাম, আমাদের রাজনীতিবিদরাও যদি এমন করে কিছু ভাবতেন!

কুমিরগুলো কোথায় গেলো?

অক্টোবর 25, 2008, দৈনিক সংবাদ

কুমির আমাদের সংস্কৃতিতে এক ভয়ানক ভাবমূর্তি নিয়ে আছে। পুজো-আর্চায় কুমিরের অধিষ্ঠান দেখেছি। মা গঙ্গার যে বাহন মকর মাছ, তাতো কুমিরের মতনই দেখতে। হিন্দিতে কুমিরকে তো মগর মাছই বলে। গ্রাম বাংলায় ব্রাত্য হিন্দুদের মধ্যে বাস্তু পুজো বলে এক পুজোর চল আছে। সেখানে মাটি দিয়ে কচ্ছপ আর কুমির বানিয়ে পুজো করা হয়। পুরান অনুসারে কচ্ছপ না হয় ধরণীকে ধারন করে আছে কিন্তু কুমিরের ভূমিকাটা কী? বাঘকে জিম করবেট নাকি বলতেন Gentleman of the Jungle। সাধারণের বিশ্বাস কুমিরের মধ্যে কোনো ভদ্রতা নেই। খিদে লাগুক আর না লাগুক বাগে পেলেই সে নাকি মানুষ ধরে খায়। মানুষতো ডাঙায় বাস করে। তাকে বাগে পাওয়ার জন্য কুমিরকে নিশ্চয়ই ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়। "পানিতে কুমির বাস করে আর কুমির মানুষ খায়" এই বিশ্বাস আমাদের আজন্ম। কুমিরের এই ভাবমূর্তিই তাকে হয়তো খেটে খাওয়া ব্রাত্য জনগোষ্ঠির দেবতা বা অপদেবতা বানিয়েছে। কারণ এই মানুষদেরকে জীবনের প্রয়োজনে একসময় কুমিরের কাছাকাছি আসতে হতো।

কুমির বলতে অনেক রকমের কুমির আছে। আমাদের দেশের যাদের মানুষ খাওয়ার বদনাম আছে তারা হলো মোহনার কুমির বা নোনা পানির কুমির (*Crocodylus porosus*) আর মিঠা পানির কুমির (*Crocodylus palustris*) । আর আছে ঘড়িয়াল বা মেছো কুমির (*Gavialis gangeticus*) । এদের মানুষ ধরার কথা শুনা যায় না। আমাদের আলোচ্য বিষয় মিঠা পানির কুমির। এরা এক সময় বাংলাদেশের সব নদ-নদীতে ছিল। কপোতাক্ষ নদে কুমিরের ভয়ের কথা বলেছেন বিভুতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় তাঁর ইছামতি উপন্যাসে। জসীম উদ্দীন তাঁর জীবন কথায়' কুমিরের উল্লেখ করেছেন। সেটা হয়তো ১০০ বছর বা তার কিছু আগের কথা হবে। এভাবে অনেক সাহিত্যিকের লেখায় কুমির প্রসঙ্গ নিশ্চয়ই আছে। এক সময় গড়াই এবং তার শাখা নদীতেও যথেষ্ট কুমির ছিল বলে শোনা যায়। তখন নদীতে গোসলের জায়গাটা বাঁশের খোয়াড় বানিয়ে ঘিরে রাখা হতো। খোয়াড়ের বাইরে নামলেই নাকি রক্ষে ছিল না। খুবই ব্যক্তিগত কয়েকটা উদাহরণ আমাকে দিতেই হচ্ছে। এক মহিলাকে কুমিরে নেওয়ার গল্প শুনেছিলাম অনেক আগে। ঘটনাটি

আমাদের চার-পাঁচ প্রজন্ম আগের। তাকে নাকি খোঁয়াড়ের বাইরে নামতেই কুমিরে নিয়ে যায়। মাগুরা জেলার গড়াইপাড়ের Avgjmvi গ্রামের প্রাচীন লোকেরা এখনও হয়তো এই কাহিনীর চর্বিত চর্বন করে থাকেন। এই গ্রাম থেকেই আমার শৈশবে একটি ছড়া শিখেছিলাম। ছড়াটি এমন, ”হায়রে নবীন হায়! কি করতে গিছলি তোর বুড়া চাচার নায়”। এর কিছুটা ভুমিকা ছিল। এটা ছিল কোনো এক মায়ের অসহায় আর্তনাদ, যার ছেলে নবীন, বুড়ো চাচার নৌকায় গিয়ে কুমিরের শিকার হয়। আমার দাদুর কাছে শুনেছি, তাদের শৈশবে তারা শুনতেন গড়াই নদী থেকে কুমিরে মানুষ নেওয়ার কথা। তিনি বলতেন, 'আজ হয়তো উজান থেকে একজন কুমিরের পেটে গেল তো কয়েক দিন পরে ভাটি থেকে একজন'। আমার বাবা একবার কুমিরের শিকারে পরিণত হতে হতে বেঁচে যান। আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর আগের কথা। তখন সম্ভবত তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। স্কুলে যাওয়ার পথে খেয়াপারের অপেক্ষায় নদীর পাড়ে জলের কিনারা ঘেঁসা বটের শিকড়ে বসে ছিলেন। গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ছোট্ট নদীতেও (গড়াই থেকে বের হয়ে গড়াইয়ে মিশে যাওয়া সিরাজপুরের হাওর) তখন কুমিরের আনাগোনা ছিল। কুমিরকে অ্যামবুশ করতে দেখে কেউ একজন নদীর অপর পার থেকে চিৎকার করে ওঠেছিলেন। বাবা লাফিয়ে পাড়ে উঠে বেঁচে যান। বাবা এখনও একথা এভাবেই স্মরণ করেন। কুমির শিকার ধরার মূহুর্তে অসম্ভব তড়িৎ গতিতে কাজ সারে। কিন্তু তার আগের প্রস্তুতি পর্বটা নাকি ধীরে ধীরে সারে। বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন কুমিরের কিছুটা ল্যাথার্জিক স্বভাব আছে। হয়তো শিকারের অপেক্ষায় বা এমনি এমনি সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক খন্ড গাছের গুঁড়ির মতো পড়ে থাকতে পারে। অবশ্য এটাও একটা শিকার ধরার কৌশল। বলা যায় Camoflage বা কূটবেশ ধরা। তাই বুঝি রক্ষে। বড়াল-গুমানি নদীতেও একসময় কুমির ছিল বলে জানা যায়। পাবনার চাটমোহর উপজেলার মির্জাপুর গ্রামের আমার নিজের শতবর্ষি (প্রকৃত বয়স ১০০ বছরের বেশি) নিকট আত্মীয়া শ্রীমতি মেনকাসুন্দরী সাহার মুখে গুমানি নদীর কুমিরের গল্প শুনেছি। বাজারের এক 'পানওয়ালী বারাঙ্গনাকে' কিভাবে পান ধোওয়ার সময় কুমিরে নিয়ে যায় তা তিনি আমাকে বলেছেন। এখনও বেঁচে আছেন তিনি। বারাঙ্গনাকে কুমিরে নেওয়ার গল্পটা আমি সুযোগ পেলে তার কাছ থেকে এখনও শুনি। হাছন রাজার ছেলে দেওয়ান গনিউর রাজার একটি লেখায় (বিচিত্রায় প্রকাশিত একটি ডায়েরি ধর্মী লেখা) নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষ্যা নদীতে কুমিরের উৎপাতের কথা লিখেছেন। পুরোনো ব্রহ্মপুত্রের পাড়ের একবুড়ির ছাগল কুমিরে নেওয়ার গল্প আমাকে কে যেন বলেছিল। কিন্তু গল্পটা গল্প না হয়ে বাস্তবই মনে হয়। এবারে নিজের সরাসরি অভিজ্ঞতার কথা বলি। গত শতকের ১৯৬৮ সালের কথা। আমি তখন হাইস্কুলের একেবারে প্রথম ক্লাসে। সম্ভবত ভাদ্র মাস। নদী ভরা ছিল। স্কুলে গিয়েই খবর শুনলাম নদীতে কুমির এসেছে। বিনা নোটিশে খালি হয়ে গেল স্কুল। আমরাও একসময় সামিল হলাম। সেই কুমির আমি নিজের চোখে দেখেছি। এও দেখেছি, কয়েকজন বন্দুকধারী তাকে গুলি করে মারার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পারেনি। সেটা কি জাতের কুমির ছিল আজো আমি নিশ্চিত না। চিড়িয়াখানার কুমির আর ন্যাশনাল জিওগ্রাফির কুমির দেখে আমার মনে হয় সেটা ঘড়িয়াল ছিল না। যদিও অনেকের মন্তব্য ছিল সেটা ঘড়িয়াল। এই কুমিরকে কেই মারতে পারেনি। তবে তাকে পরের দিন থেকে আর দেখা যায়নি। এই যে আমি কুমিরের কিছু কথা বললাম তা শুধু বলার জন্যই বলা না। আপনি যদি একজন প্রাণিবিশারদ হয়ে থাকেন তবে (একজন পরিসংখ্যানবিদকে সাথে নিয়ে) আমার বর্ণনা মাফিক আজ থেকে ৪০ কিংবা ৫০ কিংবা ১০০ বছর আগে দেশে কতগুলো কুমির ছিল তার একটা ধারনা করতে পারবেন। ভারতের সাবেক শিক্ষামন্ত্রী (শিক্ষাবিদ-সাহিত্যিক এবং

মৌলানা আযাদের স্নেহভাজন) ফরিদপুরের হুমায়ুন কবীরের ”নদী ও নারী” উপন্যাসে কুমির মেরে কবিরাজি অষুধ বানানোর কথা আছে। অথচ আজ অষুধ করতেও আমাদের নদ-নদীতে একটা মিঠা পানির কুমির খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ছাড়া অবস্থায় নেই সত্যি কিন্তু বাঁধা অবস্থায় এখনও দু-এক জায়গায় এই জাতের কুমির আছে বলে জানা যায়। যেমন মীরপুর চিড়িয়াখানায়। এছাড়া আছে খানজাহান আলীর (রাঃ) ষাটগম্বুজ মসজিদ সংলগ্ন পুকুরে। এই সাধক মহাপুরুষ ত্রিকালদর্শী ছিলেন বলে মনে হয়। ভাগ্যিস অন্তত একজোড়া কুমিরকে তিনি তাঁর মতো করে সংরক্ষণ কছিলেন। নইলে বাংলাদেশের কোথাও একটি মিঠে পানির কুমির অবশিষ্ট থাকতো না। কয়েক শ’ বছর ধরে এই গুলো এই পুকুরেই বড় হচ্ছে, বংশ বৃদ্ধি করছে এবং মারা যাচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে কোনো বদনাম নেই। বরং খানজাহান আলীর (রাঃ) স্মৃতি বিজড়িত বিধায় কুমিরগুলো সাধারণ মানুষের অসম্ভব শ্রদ্ধা এবং সমীহ পেয়ে আসছে। অথচ এবারে এক অদ্ভূত ঘটনা ঘটে গেলো। একজন মানত্‌কারীকে খেয়ে ফেলেছে এক কুমির। এ.এফ.বি’র বরাতে সারা বিশ্ব জেনেছে ব্যাপারটা। ঘটনাটা সম্ভবত ২৩ আগস্ট ২০০৮ এর। পৃথিবীর বহু নাম করা কাগজেই গুরুত্ব সহকারে এই ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে। সব খবরেই বলা হয়েছে যে এই মুসলিম তীর্থস্থানের কুমিরগুলো বেশ বন্ধুসুলভ। ঘটনাটা যা ঘটেছে অপ্রত্যাশিত।

এই কুমিরগুলো নিয়ে অনেক মিথ চালু আছে বাজারে। বহু আগে এক ক্যানভাসারের (সম্ভবত খান জাহান আলী (রাঃ)’র মাজারের একজন খাদেম যিনি সর্বরোগের তাবিজ বিক্রী করছিলেন) মুখে শুনেছিলাম কালাপাহাড় এবং ধলা পাহাড় নামের কুমির জুটি নাকি খান জাহান আলী (রাঃ) এবং তার সেনাপতির ব্যবহৃত ঘোড়ার পরিবর্তিত রূপ। অর্থাৎ ঘোড়াকে কুমির বানিয়ে রাখা হয় মাজার সংলগ্ন পুকুরে। প্রকৃতপক্ষে কুমিরগুলো Marsh Crocodile (*Crocodylus palustris*) বা মিঠে পানির কুমির। ভারতীয় কুমিরও বলে। পাকিস্তানের সিন্ধু নদী, নেপাল ও বাংলাদেশে প্রধান প্রধান নদী এবং জলাশয়ে এদের বাস। শ্রীলঙ্কার নদী এবং পুরোনো রাজা-মহারাজাদের কাটা দীঘিতে এই কুমির আছে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলেও এদের পাওয়া যায় বলে কোথাও কোথাও উল্লেখ আছে। এক সময় বাংলাদেশের নদ-নদীতে এগুলো বেশ দেখা যেত তা আমি আগেই কিছুটা বুঝানোর চেষ্টা করেছি। সেখান থেকেই এগুলো কোনোভাবে হয়তো খান জাহান আলী (রাঃ) মিঠে পানির পুকুরে আটকা পড়ে যায়। এবং পীরের নেক-নজরে পড়ে। পুকুরটা পেল্লাই সাইজের। তাই কুমিরের জন্য তেমন অসুবিধা হওয়ার কথা না। আর পূন্যস্থান সংলগ্ন হওয়ায় মানতের ছাগলটা-মুরগিটা পেতে কোনো অসুবিধা নেই। ডাঙার হিংস্র পশুরাতো পোষ মানে। পানির প্রাণিদের ব্যাপারে কি হয় কে জানে? তবে পালিত পুকুরের মাছ যে গা ঘেঁষে সাঁতার কাটে সেটা আমি দেখেছি। তাই ওখানকার কুমিরগুলোর মধ্যে মানুষের প্রতি একটা বন্ধুসুলভ আচরণ গড়ে উঠা অসম্ভব না। বিশেষকরে কয়েক পুরুষধরে ওরাতো মানুষের কাছাকাছি আছে। তবে শুনেছি মানতের মাল নিয়ে অনেক সময় মানুষে-কুমিরে ভুল বুঝাবুঝি হয়। মানুষধরার ব্যাপারটা সেখানেই কিনা, প্রাণিবিজ্ঞানীরা একটু নেড়েচেড়ে দেখতে পারেন।

কথিত কালাপাহাড়-ধলাপাহাড় এখন আর নেই। কুমিরের পরমায়ু কয়েক শ' বছর শোনা যায়। অস্ট্রেলিয়ার এক তথ্য অনুসারে মিঠা পানির কুমিরের বেঁচে থাকার সর্বোচ্চ রেকর্ড আছে ১৩০ বছর। আরও কিছু রেকর্ড দেখেছি ৫০-১০০ বছর বেঁচে থাকার। বিজ্ঞানীদের মতে কুমিরের বয়সের নির্ণয়ের সঠিক কোনো পদ্ধতি নেই। তাই এগুলো যে সঠিক বয়স তা বলা যাবে না। কালাপাহাড় আর ধলাপাহাড়ের কত বছর বয়স হয়েছিল যদি জানা যেত তবে ভালো হতো। ষাট গম্বুজ মসজিদ বানানো হয় ১৪৫৯ সালে। কুমির যদি সেই সময়ে ছাড়া হয় তাহলে তাদের বয়স দাঁড়ায় ৫০০ বছরের উপর। সেটা কতখানি যুক্তিযুক্ত? এমনওতো হতে পারে প্রথম যে কালাপাহাড়-ধলাপাহাড় জুটি ছিল তারা নেই। পরে কোনো নতুন জুটিকে আবার একই নামে নামাকরণ করা হয়েছে। এবং যদি কয়েকপ্রজন্ম আগে করা হয়ে থাকে তবে তো এই প্রজন্মের কেউ নাও জানতে পারেন। প্রখ্যাত প্রাণিবিজ্ঞানী ড. আলী রেজা খান চট্টোগ্রামের বায়েজিদ বোস্ত্মমী (রাঃ)'র মাজারের কচ্ছপ নিয়ে গবেষণা করেছেন বলে শুনেছি। তিনি রাজশাহির পদ্মা নদীর ঘড়িয়াল নিয়েও কাজ করেছেন । কিন্তু বাংলাদেশের জন্য অমূল্য সম্পদ এই মিঠা পানির কুমিরগুলো নিয়ে তিনি বা তাঁর সহযোগী গবেষকরা কোনো গবেষণা করেছেন বলে আমার কাছে কোনো তথ্য নেই। সম্ভবত করেননি। যদি করতেন তা হলে এই প্রাণি দুটোর বয়স সম্বন্ধে মোটামুটি ধারনা করা যেত। আমাদের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে পরিবেশের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবের এক অমিয় ভান্ডারের সন্ধানও আমরা এখান থেকে জানতে পারতাম। বিজ্ঞান এবং মিথকে পাশাপাশি রেখে বিচার বিশে□ষণ করে দেখা দরকার। কারণ দুঃখজনক হলেও সত্য যে বাংলাদেশের মাটিতে এই প্রাণীটি অস্তিত্বহীন হওয়ার পথে। এই ষাট গম্বুজ মসজিদের সংরক্ষিত পুকুর থেকেও কয়েকটি কুমির এদিক-ওদিক পাচার হয়ে থাকতে পারে। এবারে জরুরী অবস্থার কারণে পুরোন ঢাকার একটি মসজিদের পুকুর থেকে একটি পরিত্যক্ত কুমির উদ্ধার করা হয়। আরেকটি করা হয় নোয়াখালি থেকে। চিড়িয়া খানায় দু-একটি থাকবে এটাই স্বাভাবিক। সেখানে আবার ভারত থেকে কিছু আনা হয়েছে কয়েক বছর আগে, শুধুমাত্র প্রজননের উদ্দেশ্যে।

কুমির বিশ-চব্বিশ কোটি বছর ধরে পৃথিবীতে টিকে আছে। অথচ ডাইনোসর পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে সাড়ে ছ'কোটি বছর আগে। এরা ডাইনোসরের পৃথিবীতে আগমন এবং প্রস্থান দুটোই প্রত্যক্ষ্য করেছে। সৃষ্টির কাল থেকে দৈহিক গড়নেও তেমন পরিবর্তন আসেনি। এরা জীবন্ত ফসিল (ভড়ংংরষব)। এক কথায় কুমির এক শক্ত জীব, সহজে নিঃশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার বান্দা না। তাহলে আমাদের মিঠা পানির কুমিরগুলো কোথায় গেল? আমারের খাবারের তালিকায় কুমির নেই। এর আগে এর চামড়ার এত চাহিদা ছিল বলে মনে হয় না। হুমায়ুন কবীরের উপন্যাসের মতো দু-একটা কুমির মেরে কবিরাজী অষুধ বানালেও শেষ হওয়ার কথা না। নাকি এদেশে বৃটিশ রাজের বন্দুকধারী রাজকর্মচারী আর তার চাটুকারদের শিকারে পরিণত হলো। ঈৎড়পড়ফরষব ঐঁহঃবৎ বলে এক অস্ট্রেলিয় সিনেমার কথা জানি। সেখানে নির্বিচারে কুমির মারার কথা আছে নিশ্চয়ই। আমাদের দেশের নদ-নদীগুলোতে এমনি তান্ডব চলেছে কিনা কে জানে? বাঘ নিঃশ্চিহ্ন করার ব্যাপারে এমন কিছু তথাকথিত বিরোচিত ডকুমেন্টারি আমরা টিভিতে দেখেছি। কিন্তু কুমিরের বেলায় তেমন কিছু আছে বলে জানতে পারিনি। তাহলে কি বহু আগেই বৈরী প্রতিবেশের প্রচ্ছন্ন হুমকি ছিল। যার প্রথম ধাক্কা গেছে কুমিরের উপর দিয়ে। তাহলে কী ছিল সেই বৈরী পরিবেশ। জনসংখ্যাবৃদ্ধি এবং বেপরোয়া ভাবে প্রতিবেশের উপর চাপ প্রয়োগ হয়তো একটা কারণ হতে পারে। কিন্তু আমাদের কুমিরতো এর বেশ আগে থেকেই কমতে শুরু করে। ষাট গম্বুজ মসজিদের সংরক্ষিত

পুকরের কালাপাহাড়-ধলাপাহাড় বেঁচে থাকলে আজ তাদের নিয়ে গবেষণা করে একারণ বের করা যেতো মনে হয়। কিন্তু সে সুযোগ আর নেই। এখন যে কুমিরগুলো আছে সেগুলো দিয়ে এই কাজ চলে কিনা! যাহোক কুমিরগুলো নিঃশ্চিহ্ন হয়ে আমাদেরকে কি কোনো ডধশবঁঢ় পধষষ দিয়ে গেছে? দিলেও আমরা তখন শুনতে পাইনি। এখন আমাদের শুনতে হবে। আমাদের বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই জীবন্ত এই ফসিলকে নিয়ে আরও অনেককিছু খুঁজে বের করা জরুরী।

ev‡qvBbd‡gwUKm wel‡qK wKQ K_v

Technology Today, 2008

স্কুলের পন্ডিত মশাইয়ের কাছে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের একটি উপকথা শুনেছিলাম। সম্ভবত উপকথাটি পঞ্চতন্ত্র থেকে নেওয়া। তিন বন্ধু গুরুর কাছে যায় গুপ্তবিদ্যা শিখতে। যেহেতু গুপ্তবিদ্যা। তাই গুরুদেব তিনজনকেই আলাদা করে তিনটি বিদ্যা শিখিয়ে দেন। গুপ্তবিদ্যা গুপ্তই রাখতে হয়। নইলে ফলে না। এমনই বিশ্বাস। বিদ্যা শিক্ষার পর তিন বন্ধু একদিন দেশের পথে রওয়ানা হয়। পথে একটি হাড়ের টুকরো দেখে একজনের কৌতুহল হয় তার গুপ্ত বিদ্যার ক্ষমতা যাচাইয়ের। যেই ভাবা সেই কাজ। দেখা গেলো হাড়টি একটি চতুস্পদ জন্তুর কঙ্কালে পরিণত হলো। এরপর দ্বিতীয় বন্ধু এগিয়ে আসলো। তার কেরামতিতে কঙ্কালে মাংশপেশী এবং চামড়ার আচ্ছাদন তৈরি হলো। অতঃপর বুঝা গেলো যে সেটা একটা সিংহের শরীর। এরপরতো আর এগুনো যায় না। তৃতীয় বন্ধু কিন্তু নাছোড়বান্দা। তার বিদ্যেও যাচাই করতে হবে। করা হলো। এবং এর পরিণতি দাঁড়ালো ভয়ঙ্কর। সবাই সেই সিংহের হাতে মারা গেলো। নিশ্চয়ই লোকশিক্ষার জন্য এই উপকথাটি রচনা করা হয়েছিলো । হয়তো রচনাকারী বুঝাতে চেয়েছিলেন, বিদ্যারও স্থান-কাল-পাত্র ভেদ আছে। কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে এটাই শুধু শেষ কথা নয়। হয়তো বা সেই অজ্ঞাত রচনাকারী আরও ভেবেছিলেন, এক টুকরো হাড়ের মধ্যে জীবনের সব কলা-কৌশল লুকানো আছে। তাই হাড় থেকে যদি আবার পরিপূর্ণ একটি জীবদেহ ফিরে পাওয়া যেতো! আজকের দিনে আমরা যেমন ভাবছি জীবনের অগাধ রহস্য লুকিয়ে আছে জিনোম অর্থাৎ কোষের ভিতরের ক্রোমোজম বরাবর সব জিনের ভিতরে। স্পিলবার্গের জুরাসিক পার্ক ছায়াছবির কথা বলা যায়। সেখানে জুরাসিক যুগের ডাইনোসরদের ফিরে আসার কাহিনীটা এর কাছাকাছি। ছবির বিজ্ঞানীরা বিলুপ্ত এই প্রাণীটি ল্যাবরেটরিতে তৈরি করে বলে মনে হয়। যদ্দূর মনে পড়ে তাঁরা ডাইনোসরের জীবাশ্মের মধ্যে DNA অনুক্রমের প্রতিলিপি খুঁজে পান। এই অনুক্রমের প্রতিলিপিকে ডিকোড করে ঐ বিজ্ঞানীরা ডাইনোসরই বানিয়ে ফেলে। আমার বিশ্বাস স্পিলবার্গ বায়োইনফর্মেটিকসের কথা ভালোভাবেই জানতেন। আর এজন্যই এমনই একটি কাহিনীর অবতারনা করতে পেরেছিলেন। বাস্তবে কিন্তু শুধু বড় প্রাণী নয় ব্যাক্টেরিয়ার জীবাশ্মও আবিস্কৃত হচ্ছে। এই সমস্ত জীবাশ্মের সাথে বিলুপ্ত প্রজাতির DNA অনুক্রমের প্রতিলিপির ছাঁচ থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। বিজ্ঞানীরা এগুলোর পাঠ উদ্ধার করে অবলুপ্ত প্রাণীর একটি কৌলিক অবকাঠামো দাঁড় করাতে পারবেন বলে ধারনা করা যায়। এবং সম্ভব হতে পারে বায়োইনফর্মেটিকসের কারণেই।

বায়োইনফর্মেটিকস শব্দটি সাধারণের কাছে এখনও তেমন পরিচিত নয়। তবে যারা বায়োটেকনোলোজী, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা কম্পিউটার বিজ্ঞান নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন তারা ইতোমধ্যে জেনে গেছেন বায়োইনফর্মেটিকস আসলে

কি। এটা হলো কম্পিউটার যুগেরই একটি উপজাত বিজ্ঞান। বলতে গেলে ক্লাসিক্যাল জীববিজ্ঞান, কম্পিউটার সায়েন্স এবং তথ্যপ্রযুক্তির ত্রিবেণী সঙ্গম হয়েছে এই বিজ্ঞানে। যার চূড়ান্ড় লক্ষ্য হলো মানব কল্যানে সরাসরি নিয়োজিত জীববিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর করা। তারপরেও বোধ হয় কম বলা হয়। প্রায়েগিক অঙ্কশাস্ত্র, পরিসংখ্যান, রসায়নবিদ্যা, প্রাণ রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, আর্টিফিসিয়াল বুদ্ধিমত্যা এই সবই বায়োইনফর্মেটিকস-এর ভিত রচনায় সহায়ক হিসাবে কাজ করছে।

এক সময় জীববিদ্যার সাথে অঙ্কের সম্পর্ক তেমন নিবিড় ছিলো না। অনেক জীববিজ্ঞানী অঙ্ককে এড়িয়ে চলতেন বলে মনে হয়েছে বা অঙ্কের ব্যবহার করতেন কম। কিন্তু যখন নির্দিষ্ট একটি প্রাণী বা একটি উদ্ভিদের বৃদ্ধি-বৈশিষ্ট্য বিশে�ষণের দরকার হলো তখন একজন জীববিজ্ঞানীকে অবশ্যই অঙ্কের শরনাপন্ন হতে হলো। কিংবা একাধিক প্রাণী বা উদ্ভিদকে যখন একটি কমুনিটি হিসাবে চিন্ড্র করা হয় বা উদ্ভিদ, প্রাণী এবং তার প্রতিবেশ নিয়ে কাজ করতে হয় তখন অঙ্ক ছাড়া উপায় থাকে না। জীববিজ্ঞানী প্রফেসর ফিশার বোধহয় বিষয়টা উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা এবং উপস্থাপনার জন্য প্রায়েগিক অঙ্কশাস্ত্রকে ব্যবহার করতে শুর্ করেন। এজন্যই প্রফেসর ফিশার পরিসংখ্যানের পুরোধা হিসাবে স্বীকৃত। অবশ্য জীববিজ্ঞানের সাথে রসায়ন শাস্ত্র এমনকি পদার্থবিজ্ঞানেরও নিবিড় যোগাযোগ গড়ে উঠেছে বেশ আগেই। প্রয়োজনে রসায়নবিদ বা পদার্থবিজ্ঞানী জীববিজ্ঞান গবেষণায় তাাদের হাতই আগে বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং জীববিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছেন। জার্মান রসায়নবিদ জানটাস ভন লিবিগ (১৮০৩-১৮৭৩) খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গাছ ও মাটির পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে প্রথম গবেষণা শুর্ করেন। আমাদের আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু জীববিজ্ঞান গবেষণায় তাঁর সময়ের থেকে অনেক এগিয়ে ছিলেন। তিনি মূলত একজন পদার্থ বিজ্ঞানী চিলেন। এজন্য তাঁর গবেষণা কার্যক্রমে গাছের প্রকৃতি বিচারের জন্য তিনি নিজের আবিস্কৃত যে সমস্ড় যন্ত্রপাতি (অনেক ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি) ও পদ্ধতিসমূহ ব্যবহার করেছিলেন এক কথায় সেগুলো ছিলো অভিনব। বিনা তারে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ পাঠানোর অগ্রদূত এই বিজ্ঞানীর কাছ থেকেই আমরা জীববিজ্ঞান গবেষণায় পদার্থবিদ্যার লাগসই প্রয়োগ পদ্ধতি জানতে পেরেছি। তিনিই বায়োফিজিক্স বা জীব-পদার্থবিদ্যার জনক। এভাবেই জীববিজ্ঞান ও অন্যান্য বিজ্ঞান পরস্পরের কাছাকাছি আসার ফলেই জৈব রসায়ন, প্রাণ রসায়ন, জীব-পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি নামে বিজ্ঞানের নতুন নতুন শাখা সৃষ্টি হয়েছে। মলিকুলার বায়োলজির সূত্রপাত এখান থেকেই। বিশ শতকের শেষ অর্ধেক থেকে মলিকুলার বায়োলজির উপর ভিত্তি করে জীববিদ্যা নতুন মোড় নিতে শুর্ করে। জীব ও জীবনের গঠন বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে অণু এবং কোষ বিষয়ক গবেষণায় প্রভূত উন্নতি হয়। তবে প্রথম দিকের গবেষণায় তেমন সমন্বিত Approach ছিলো না। এক এক জন গবেষক অনেকটা স্বাধীনভাবেই একটি বিষয়ভিত্তিক গবেষণা করতেন। এমনিতর চলতে থাকলে জীববিদ্যার বর্তমান স্ড়রে পৌঁছানো সম্ভব হতো কিনা বলা কঠিন। মলিকুলার বায়োলজীর অন্যতম আবিষ্কার DNA এর গঠন বৈচিত্র্য। এটা জানা না গেলে আজকের মলিকুলার বায়োলজীর উন্নয়ন বা জিন প্রকৌশল বিদ্যার জন্ম হতো না। এজন্য যাঁদেরকে কৃতিত্ব দিতে হয় তাঁরা হলেন ওয়াটসন এবং ক্রিক। তাঁদের একজন ছিলেন পদার্থবিদ আরেকজন প্রাণ রসায়নবিদ। পৃথিবীতে দেশভেদে গবেষণাগার বা গবেষকের অন্ড় নেই। হয়তো মান সম্পন্ন গবেষণা নিয়ে কথা উঠতে

পারে। তবে ভালো গবেষণার ফলাফল সবাই ব্যবহার করতে পারে। এজন্য সবদেশে সব গবেষণাগারে কিছু কিছু বিজ্ঞানীদের তাদের সাধ্য অনুযায়ী গবেষণা করে যাওয়া দরকার। এবং করছেনও। এদের কেউ করছেন মৌলিক গবেষণা, কেউ বা প্রায়োগিক। কেউ হয়তো একটি জিনের বৈশিষ্ট্য নিয়ে। কেউ বা এই জিন পরিবেশ পরিস্থিতি সাপেক্ষে তার বাহক প্রাণী বা উদ্ভিদের ভিতরে থেকে কীরূপ আচরণ করতে পারে তা নিয়ে। এই গবেষণা করতে গিয়ে একজন গবেষক যদি আরেকজনের প্রাপ্ত ফলাফল থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখেন তাহলে তা হবে চার কানার হাতি দেখার মতো। সবাই স্পর্শ করে হাতি দেখার স্বাদ পূরণ করলেও হাতির প্রকৃত আকার তাদের কাছে অজানাই থেকে যায়। এজন্য চার কানাকে যা করতে হতো তাহলো হাতি ছুঁয়ে দেখার পর নিজেরা বসে তাদের অধীত জ্ঞানের সমন্বয় করে নেওয়া। তাহলেই তারা হাতি বিষয়ে মোটামুটি একটা ধারনা করে নিতে পারতো। একইভাবে পরিপূর্ণভাবে জীবনের অর্থ অনুধাবনের জন্য অণু , কোষ-কলা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, এগুলোর উপর আলাদা আলাদা গবেষণাও যেমন করতে হবে, আবার একই সাথে এগুলোর সমন্বয় সাধনের জন্য একটা System level approachও চালিয়ে যেতে হবে। System level approach হলো শুধুমাত্র আলাদাভাবে জিন, প্রোটিন বা এই জাতীয় কোনো অস্‌িত্ব নিয়ে কাজ নয়, এগুলো কীভাবে একে অপরের পরিপূরক হয়ে জীবনের প্রয়োজনে কাজ করে তা জানা। অর্থাৎ সমন্বিত approach । আর এই জন্য একটি গবেষণাগার বা কতিপয় গবেষকই যথেষ্ট নয়। এর জন্য দরকার বিভিন্ন গবেষণাগারের বিভিন্ন পটভূমির বিজ্ঞানীদের স্বতস্ফূর্ত অংশ গ্রহণ। এর আরেক অর্থ হলো নিজেদের মধ্যে তথ্য-উপাত্তের চালাচালি করা। এজন্য দেশে দেশে যে গবেষণ্াই করা হোক না কেন তার উলে্লখযোগ্য অংশ বিভিন্ন জর্নালে প্রকাশ করা হয়। উদ্দেশ্য এখানে প্রকাশিত তথ্য-উপাত্ত নিয়ে আরেকজন যেন তাঁর গবেষণায় নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে। কিন্তু আজকাল এই তথ্য উপাত্তের ভার এতটাই ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ছে যে তাকে আর ছাপানো ফর্মাটে আটকে রাখা যাচ্ছে না। তাই বিশেষভাবে সেগুলো ডিজিটাল ফর্মাটে জমা করা হচ্ছে যাতে প্রয়োজনে কেউ মাউস ক্লিক করেই কাজে লাগাতে পারে। এটাযে জীববিজ্ঞান গবেষণায় বিশাল এক সংযোজন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ইতোমধ্যেই অনেকে বলছেন জীববিজ্ঞান গবেষণার অনেকটাই Wet lab থেকে Dry lab এ সরে যাচ্ছে। অর্থাৎ জীববিজ্ঞানের গবেষণা মাঠে-ময়দান বা গতানুগতিক গবেষণাগার থেকে অনেকটাই কম্পিউটার ভিত্তিক হওয়ার সম্ভবনা। বলে রাখা ভালো এই গবেষণা কিন্তু পুরোটা কম্পিউটার ভিত্তিক হওয়া সম্ভব না। কারণ তথ্য-উপাত্তের প্রয়োজনে অবশ্যই আমাদেরকে কম্পিউটারের বাইরে অনেক কিছু করবার আছে। আর মাঠ বা প্রকৃত বাস্তুসংস্থান ভিত্তিক উপাত্ত সরবরাহ করতে না পারলে কম্পিউটার এগুবে কী নিয়ে। এখানে জীববিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করবার জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথ্য-উপাত্ত নিয়ে গবেষণা এবং আদানপ্রদানের যে ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাল ষড়জালের কথা বলা হলো তাই বায়োইনফর্মেটিকস।

বায়োইনফর্মেটিক্সের জন্য উপাত্তের একটা বড় চালান আসে জিন-বিষয়ক গবেষণা থেকে। ক্লাসিক্যাল জীববিজ্ঞানের প্রধান বিষয় হলো জিন। জিন জীবনের বৈশিষ্ট্য ধারন করে। এই প্রসঙ্গে পঞ্চতন্ত্রের আরেকটা গল্পের কথা মনে পড়ে গেলো। এক বাচ্চা মাদি ইঁদুরকে এক মুনি আদরযত্নে লালন পালন করতে শুর্ করলেন। মুনি দেখলেন ইঁদুরকে ইঁদুর হিসাবে পালন করা ঝুঁকিপূর্ণ। তাই সেটাকে যোগবলে বালিকায় রূপান্ড়রিত করলেন। একসময় বিয়ের উপযুক্ত হলে মুনি

তাকে জিজ্ঞাসা করলেন কিরকম পাত্রকে তার পছন্দ। বালিকা এক কথায় জবাব দিল, পাহাড়কে যে পরাস্ত করতে পারে তাকেই সে বিয়ে করবে। মুনি দেখলেন পাহাড়কে কেবল মাত্র মুষিক অর্থাৎ ইঁদুরই পরাস্ত করতে পারে। কারণ ইঁদুর পাহাড়ের গায়ে অজস্র গর্ত করে পাহাড়কে পরাজিতই করে বৈকি। মুনি বালিকাকে আবার ইঁদুরে রূপান্তরিত করলেন এবং ইঁদুরের সাথেই তার বিয়ের ব্যবস্থা করলেন। এই উপকথা যেন প্রকট জিনের (Dominant gene) কথা মনে করিয়ে দেয়। যতই রূপান্তর ঘটুক না কেন আসলে তো বালিকাটি ইঁদুরের বৈশিষ্ট্য ধারন করছে, অর্থাৎ ইঁদুরের জিন বহন করছে। এবং সেটা যে তার ইচ্ছাশক্তিতে প্রভাব বিস্তার করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সেখানে মানুষে রূপান্তরের ব্যাপারটা প্রচ্ছন্ন। যাহোক গল্প থেকে আমরা শিক্ষা নেই। মানুষ মানুষই থাকে আর ইঁদুর ইদুরই। এই জিনের অবস্থান হলো জীবকোষের নিউক্লিয়াসের DNA তে। এটা দুই সূত্র বিশিষ্ট নিউক্লিক এসিড। নিউক্লিক এসিড ক্ষারক (বেস), শর্করা ও ফসফেট অণু দিয়ে গঠিত। এর গঠন হলো পুরোনো দালান বাড়ির পেছন দরজার পেঁচানো সিঁড়ির (মই) মতো। এই আবিষ্কারের জন্য ওয়াটসন এবং ক্রিককে নবেল পুরষ্কার দেওয়া হয়। নিউক্লিক এসিডে দুই ধরনের ক্ষারক থাকে। পিউরিন এবং পাইরিমিডিন। পিউরিনের ক্ষারক দুটি হলো অ্যাডিনিন (A) ও গুয়ানিন(G) । আর পাইরিমিডিনের দুটো হলো থাইমিন (T) ও সাইটোসিন (C)। আরেক ধরনের নিউক্লিক এসিড হলো RNA, এক সূত্র বিশিষ্ট। DNA এর মতই চার ক্ষারক বিশিষ্ট। তবে ৪নং ক্ষারক সাইটোসিন (C) এর জায়গায় ইউরাসিল (U) বর্তমান। সাধারণত বার্তাবাহী (m-RNA), স্থানান্তরকারী (t-RNA) এবং রিবোসমাল (r-RNA) এই তিন ধরনের RNA দেখা যায়। কোষের মধ্যে কিভাবে প্রোটিন তৈরি হবে তা একটি জিন তার জেনেটিক কোড বা কোডন দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। প্রোটিন তৈরির যে বিল্ডিং ব্লক অ্যমিনো এসিড তার সংখ্যা ২০ টি। এই ২০ টি অ্যমিনো এসিডের জন্য ৬৪ টি কোডন আছে। প্রত্যেকটি কোডন তিনটি ক্ষারক দিয়ে তৈরি। যেমন AUG এবং GGU, যথাক্রমে মেথিওনিন এবং গ্লাইসিনের অর্থ বহন করে। এবং সমস্ত জীব বা জীবাণুর জন্য তা একই অর্থবোধক হয়ে থাকে। ট্রিপ্টোফেন ও মেথিওনিন ছাড়া বাকি সবগুলো অ্যমিনো এসিডের জন্য দুই বা ততোধিক কোডন ব্যবহৃত হয়। যেমন থ্রিয়োনিনের ৪টি কোডন রয়েছে। এটির নির্বাচন শুরু হয় প্রথম দুটো ক্ষারক AA দিয়ে। তিন নম্বর ক্ষারক UCAG এর যেকোনো একটি হতে পারে। লিউসিন, আরজিনিন ও সেরিনের জন্য প্রথম দুটো ক্ষারক ভিন্ন ভিন্ন। যেমন লিউসিনের জন্য UU বা CU, সেরিনের জন্য UC বা AGএবং আরজিনিনের জন্য CG বা AG। তৃতীয় স্থানে চারটি ক্ষারকের যেকোনো একটি থাকতে পারে। তৃতীয় স্থানের এই ভিন্নতার জন্য আসল প্রোটিন তৈরিতে কোনো অসুবিধা হয় না। তবে কোডনের সংবেদন ক্ষমতায় কিছুটা ঘাটতি দেখা দেয়। এ কারণেই অধিকাংশ কোডন কম ক্ষমতা সম্পন্ন অর্থাৎ অধোগামী কোডন। DNA এর অংশ থেকে বা জিন থেকে প্রোটিন সংশ্লেষণর প্রথম ধাপ শুরু। এই জিনটি অনুলেপনের মাধ্যমে একটি বার্তাবাহী m-RNA তৈরি করে। প্রোটিনের কাঠামো অর্থাৎ অনুক্রম কি হবে তা জেনেটিক কোড আকারে m-RNA তে নিহিত থাকে। পরের ধাপ অর্থকরণ। m-RNA কোডনের মারফতে রিবোসমে কি বার্তা নিয়ে আসলো তার পাঠোদ্ধার করা। এই বার্তাগুলো জিনের ইচ্ছেরই প্রতিচ্ছবি। এবং t-RNA এর সাহায্যে অ্যমিনো এসিডগুলো পর পর রিবোসমে স্থানান্তরিত হতে থাকে। সাধারণ একটা প্রোটিন হলো গ্লোবিন। এর অ্যমিনো এসিডগুলো হলো ভ্যালিন, হিসটিডিন, লিউসিন, থ্রিয়নিন, প্রোলিন, গ্লুটামিক এসিড, টাইরোসিন ও হিসটিডিন। বার্তাবহ m-RNA এর শুরুর কোডন AUG । অর্থাৎ মেথিওনিন দিয়ে

সব প্রোটিন তৈরি শুর। উপরোক্ত ৬ টি অ্যামিনো এসিডের জন্য বার্তাবহ m-RNA যে কোডন অর্থাৎ অনুক্রমগুলো ব্যবহার করবে সেগুলো হলো GUU, CAC, UUA, ACC, CCC, GAA, UAU, ও CAC। প্রোটিন সংশেষণ হওয়ার শেষ কোডন UAA থাকে m-RNA প্রান্তে। প্রোটিন প্রাণী ও উদ্ভিদের কোষ কলার জন্য খুবই জররী। অধিকাংশ প্রোটিনই প্রকারান্তরে এনযাইম। উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৈশিষ্ট্য বহনকারী জিন বা জিন সমষ্টি এই এনযামের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়। একটি DNA অণুতে অনেক জিন থাকে। তবে DNA এর পুরোটাই কিন্তু জিন নয়। জিন ছাড়া অংশকে বলে junk-DNA। কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদের ক্রোমোজমের সমস্ত DNA কে বলে জিনোম। কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদের জিনোমে অসংখ্য জিনের সমাহার থাকে। এই সমস্ত জিনের অনুক্রম মিলে মিলেই পুরো জিনোমের অনুক্রম পাওয়া যায়। এগুলো কোডন আকারে পরপর সাজানো থাকে। ১৯৭৭ সাল থেকে শত শত প্রাণী বা উদ্ভিদের শত শত জিনের ক্ষারক অনুক্রম আবিষ্কৃত হয়েছে এবং হচ্ছে। ইতোমধ্যে *Arabidopsis thaliana* নামক সরিষা জাতীয় উদ্ভিদের সম্পূর্ণ জিনোম অনুক্রম প্রকাশিত হয়েছে। জ্যাপোনিকা ধান নিপ্পনবেরের পূর্ণ জিনোম অনুক্রমও প্রকাশিত হয়েছে। ট্রপিক্যাল ধানের উপরও এধরনের কাজ এগিয়ে চলেছে। ড. কলিনসের নেতৃত্বে ১৫ বছর মেয়াদি মানুষের জিনোম প্রকল্পের কথা আমরা শুনেছি। মানুষের ২৩ টি ক্রোমোজমের লক্ষ লক্ষ জিনের জন্য লক্ষ লক্ষ ক্ষারক অনুক্রম বের করা এবং তা প্রকাশ করা চারটিখানি কথা নয়। অবশ্য ধান বা অন্য ফসলের বেলায় প্রায় একই কথা প্রযোজ্য। এজন্য বিশেষভাবে নির্মিত যন্ত্রপতি এবং শক্তিশালী কম্পিউটারের সহায়তা নেওয়া হয়ে থাকে। এই অনুক্রমগুলো আবিষ্কারের পরই তা নির্দিষ্ট কোনো ওয়েব-সাইটে দিয়ে দেওয়া হয়। ধানের জন্য এমনই একটি ওয়েব সাইট হলো http://rgp.dna/affrc.go.jp/IRGSP।

কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক। নিউরোইনফর্মেটিক্স (মানুষের ব্রেইন সংক্রান্ত ইনফর্মেটিক্স) স্নায়ুতন্ত্রের এনাটমি এবং শারীরতত্ত্ব সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য ধারন করে থাকে। এটাকে অবশ্যই মলিকুলার বায়োলজির ডাটাবেসের সাথে মিথষ্ক্রিয়ায় অংশ নিতে হবে। যাতে করে স্নায়ুতন্ত্রের সাথে জিন এবং প্রোটিন পর্যায়ের ডাটাসমূহের একটা যোগসূত্র স্থাপন করা যায়। কয়েক দশক ধরে জিন এবং প্রোটিন অনুক্রমের তুলনা জীবের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের গবেষণায় একটি অবধারিত বিষয় হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। ভবিষ্যতে শুধুমাত্র গুটিকয় জিনের অনুক্রম নয় গোটা জিনোমের অনুক্রম নিয়ে এধরনের গবেষণা তার পথ করে নেবে। পুরো জেনোম এভাবে বিবেচনায় আনা গেলে একটা নির্দিষ্ট প্রতিবেশে পাশাপাশি অবস্থিত বিভিন্ন জিনোমকে নিয়ে পরিবেশ-প্রতিবেশ এবং জীবন সংক্রান্ত গুরত্বপূর্ণ তথ্য উদঘাটন করা যাবে।

ধানের জাত উদ্ভাবনে বায়োইনফর্মেটিক্সের ব্যবহার আজকাল হরহামেশাই হচ্ছে। বর্তমানে পীড়ণ প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবনে Marker assisted backcrossing বলে এক ধরনের পদ্ধতি চালু হয়েছে। এখানে Marker assisted selection বলে এক ধরনের আকাঙ্খিত গাছের নির্বাচন পদ্ধতি আছে যেখানে গাছের নির্দিষ্ট পীড়ণের সহনশীলতা সনাক্তকরণের জন্য মলিকুলার মার্কার ব্যবহার করা হয়। মার্কার হলো এক ধরনের Sign post বা Landmarks যা অনুক্রমের মধ্যে থাকে। এই মার্কারকে diagonstic tool হিসেবে ব্যবহার করে ধানের প্রজননবিদ ও কৌলিতত্ত্ববিদরা

জার্মপ্লাজমের বৈশিষ্টায়ন ও নির্বাচন করে থাকে। এগুলো একক জিন হিসেবে মেন্ডেলের সূত্র অনুযায়ী প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে স্থানান্তরিত হয়। মার্কার কয়েক রকমের হলেও Marker assisted selection এর জন্য মলিকুলার মার্কার ব্যবহার করা হয়। এটা ক্রোমোজমের নির্দিষ্ট অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করে। মার্কার সাধারণত জিনের কাছাকাছি অবস্থান করে কিন্তু জিনের উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করে না। এই মার্কারের সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের বায়োইনফর্মেটিক্স টুল (Tool) ব্যবহার করে জেনোমের অনুক্রম তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে সহজেই। ধানের যত জেনোমের অনুক্রম ওয়েব সাইটে আছে সেখান থেকে জেনোমের যেকোনো অংশ টেনে এনে (download) অনুক্রম দেখে দেখে বা ওয়েব-নির্ভর বিভিন্ন টুল যেমন GENESCAN, Protien SCAN, Primer3 ইত্যদি ব্যবহার করে উক্ত অংশে কিধরনের মার্কার আছে তা সনাক্ত করা যায়। মলিকুলার ব্রিডিংএ বিশেষ করে Marker assisted selection এবং Marker assisted back crossing এ বিভিন্ন ধরনের মলিকুলার মার্কার ব্যবহৃত হয়। এই সকল ক্রোমোজমে এই সমস্ত মার্কারের অবস্থান ও প্রকৃতি নির্ণয়ের জন্য বায়োইনফর্মেটিক্স টুল ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন ওয়েব সাইট যেমন Grammene, TIGR, IRGSP, NCBI, Pubmed ইত্যাদি স্থানে জেনোম অনুক্রম ডাটাবেস সংরক্ষিত আছে। এগুলো ছাড়াও এই সাইটগুলোতে Published genetic markers, linkage map, QTL map, প্রভৃতি সংরক্ষিত আছে যা ব্রাউজ করে জানা যায় এবং প্রয়োজনে তুলনা করা যায়। ২০০৬ সালে বিখ্যাত Nature জর্নালের একটা আর্টিকেল অনেকের দৃষ্টি কাড়ে। আমাদের দেশের পত্র পত্রিকায় খবর হয় যে বন্যা সহনশীল একটি ধানের জাত আবিস্কৃত হয়েছে। আসলে এটাকে বন্যা সহনশীল না বলে চুবানি (জলমগ্নতা) সহনশীল বলাই ভালো ছিল। আসলে এই ধান পানির নিচে প্রায় দুই সপ্তাহ্ ডুবে থাকলেও পচে যাবে না। প্রথমত চুবানি সহনশীল FR13A জাতে চুবানি সহনশীল quantitative trait loci: Sub 1 locus (নির্দিষ্ট গুণ সম্পন্ন ক্রোমোজমের নির্দিষ্ট এলাকা) আসলে একাধিক জিনের সমষ্টি চিহ্নিত করা হয়। এটাই Fine mapping। এটাকে অবশ্যই একটা ওয়েব সাইটে ছেড়ে দেওয়া হয়। পরে তা জনপ্রিয় ভারতীয় জাত স্বর্ণাতে Marker assisted backcrossing পদ্ধতিতে backcross করা হয়। এই ক্ষেত্রে Fine mapping এর ফলাফল, নিপ্পনবেরের জিন অনুক্রম ডাটাবেস এবং Bacterial Artificial Cromosome (BAC) ক্লোনসমূহের জিন ব্যাঙ্ক অনুক্রম (http://www.ncbi.nih.gov/Genebank) হতে বিশেষ কৌশলে (Simple Sequence Repeat (SSR) Identification Tool) প্রয়োজনীয় মার্কারসমূহ সনাক্ত করা হয়। এছাড়াও আরও কিছু বিশেষ মার্কার (৬টি SSR , ২টি Insertion-deletion এবং ২টি Single Nucleotide Polymorphism) ওয়েব ভিত্তিক টুলের (http://www.genome.wi.mit.edu/cg-bin/primer3_www.cgi) সাহায্যে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বায়োইনফর্মেটিক্সের প্রাণ হলো উপাত্ত বা ডাটাবেস। এই ডাটাবেস সংরক্ষণ এবং গবেষণা কাজে ব্যবহারের জন্য প্রধান তিনটি ডিজিটাল আধার হলো Genbank at the National Center for Biotechnology Inforamation (NCBI; www.ncbi.nlm.nih.gov), the European Bioinformatics Institute (EBI, www. ebi.ac.uk), এবং DNA Data Bank of Japan (DDB; www.ddbj.nig.ac.jp)। আরও অনেক ডাটা সোর্স আছে। এদের কিছু open source। যেমন the International Crop (Rice) Information System (ICIS;

www.icis.cgiar.org)। কোনো ডাটাসোর্স যথেষ্ট ব্যয়বহুল। যাহোক এই সমস্ত ডাটাসোর্সের ব্যবহার এবং ডাটা নিয়ে আরও গবেষণা বা জিন অনুক্রম তৈরি করার জন্য এবং ডাটা অনুসন্ধানকে আরও সহজতর করার জন্য কিছু টুল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এদের মধ্যে অন্যতম হলো the European Molecular Biology Open Software Suit (EMBOSS; www.emboss.org), the Generic Model Organisation Database project (GMOD); www.gmod.org), TIGR software site (www.tiger.org/software)।

বায়োইনফর্মেটিক্স দ্রুত বর্ধনশীল বিজ্ঞান। মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই বিজ্ঞানের সম্ভাবনা অপার। জিন বিষয়ক গবেষণা থেকে শুরু করে, জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বিবর্তন, প্রোটিন এক্সপ্রেশন, ক্যানসার গবেষণা, জিন থেরাপি, পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণে এই বিজ্ঞানকে কাজে লাগানোর সুযোগ আছে। এজন্য আমাদের প্রস্তুতি দরকার। আমাদের সর্বস্তরের শিক্ষা-কারিকুলামে বায়োইনফর্মেটিক্স অন্তর্ভুক্ত করতে পারলে আজকের প্রজন্ম বিশেষভাবে উপকৃত হতো বলে মনে হয়।

Rjevq, ˆRe Rvjvwb Ges Lv`¨ wbivcËv

b‡f¤i 1, 2008, ˜wbK msev˜

পৃথিবী বুঝি সভ্যতার শুরু থেকেই ক্ষুধার্ত ছিলো। অন্যথায় কৃষি এবং কৃষ্টির জন্মই হতো না। আর কৃষি ও কৃষ্টির আরেক নাম সভ্যতা। সভ্যতাকে আশ্রয় করে মানুষে মানুষে কখনও তৈরি হয় সম্প্রীতি, কখনও বা সঙ্কট। সঙ্কটকে ঘিরে পৃথিবীতে যুদ্ধ বিগ্রহের অভাব নেই। এমনই এক সঙ্কট তৈরি হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। তখন বিশ্বময় শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে জাতিসংঘ গঠিত হয়। যুদ্ধ একসময় থেমে যায়। তবুও তথা কথিত শান্তি যেন আসতে আসতেও আসে না। অধরা এই শান্তিকে ধরতে হলে সবার আগে আসে ক্ষুধা নিবৃত্তির ধারনা। তাই গঠিত হয় জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (Food and Agriculture Organisation, FAO)। সেটা ছিল ১৯৪৫ এর ১৬ অক্টোবর। এই সংস্থার উদ্দেশ্য ছিল ক্ষুধা, অপুষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনে আন্তর্জাতিক কর্মপ্রচেষ্টাকে দিগনির্দেশনা প্রদান করা। এবং যেকোনো উদ্ভূত পরিস্থিতিকে নির্বিঘ্নে সামাল দেওয়ার তাগিদে একটা নিরেপক্ষ মঞ্চ হিসাবে কাজ করা। FAO 'র প্রতীকে একজোড়া অজানা শব্দ "Fiat panis" আমাদের দৃষ্টি কাড়ে। শব্দটা স্পেনিশ হতে পারে। এর ইংরেজি অর্থ দেখেছি let there be bread। অনেকটা "সর্ব্বেষাং মঙ্গলং ভূয়াৎ সর্ব্বে সন্তু নিরাময়াঃ", এই বেদ-বাণীর মতো। এই কথাতেই FAO 'র উদ্দেশ্য পরিষ্কার: বিশ্বব্যাপী অপুষ্টি দূর করতে সাহায্য করা । এজন্য স্থানীয় ভিত্তিতে লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষিতে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সাহায্য করা, দুর্ভিক্ষ পীড়িত কোনো জাতির দুর্ভিক্ষ প্রশমনে তাদের কৃষি পলিসি পরিবর্তন-পরিবর্ধনে সহায়তা করা, সাধারণ জনগোষ্ঠীর অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে কোনো জাতীয় অর্থনীতির শক্ত ভিত প্রতিষ্ঠায় শক্তির যোগান দেয়া; এধরনের বিভিন্ন কল্যানমুখী কাজ FAO সেবার আওতাভূক্ত।

তারপরেও দুর্ভিক্ষকে ঠিকমতো মোকাবেলা করা গেছে বলে মনে হয়নি। দুর্ভিক্ষ প্রশমনের আন্দোলনকে আরও গতিশীল করবার মানসে ১৯৭৯ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত সংস্থার ২০তম অধিবেশনে বছরের একটি দিন বিশ্ব খাদ্য দিবস হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এজন্য FAO 'র প্রতিষ্ঠা দিবস ১৬ অক্টোবরকেই বেছে নেওয়া হয়। ১৯৮০ সালের ৫ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বিশ্বব্যাপী সমস্ত জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহে এই দিবস পালনের জন্য বলা হয়। এভাবেই ১৯৮১ থেকে প্রতি বছর এই দিবস আনুষ্ঠানিকভাবে পৃথিবী ব্যাপী পালিত হয়ে আসছে। সারা পৃথিবীতে এখন প্রায় ৬০০ কোটি মানুষের বসবাস। প্রায় ৮৫কোটি মানুষকে নিয়ত ক্ষুধার জ্বালায় ভুগতে হচ্ছে। এর মধ্যে ৮২ কোটি মানুষ বাস করে উন্নয়নশীল দেশসমূহে। যারা নাকি আবার জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মুখে আছে। হতভাগ্য এই মানুষদেরকে কাছে বছরের একটি দিন কিছুটা হলেও আশার বাণী পৌঁছে দিতে পারে বলে মনে হয়।

কিছুক্ষণ আগেই যে ৬০০ কোটি মানুষের কথা বলা হলো তা ইতোমধ্যেই ছাড়িয়ে গেছে বেশ কিছু। প্রতি মূহূর্তে অন্তত একজন করে মানুষ বাড়ছে। এবং মানুষ বাড়তেই থাকবে। সেই সাথে তাল মিলিয়ে মানুষের চাহিদাও বাড়তে থাকবে। ২০৫০ সাল নাগাদ এগুলো সবই দ্বিগুণ হয়ে যাবে। তাই ক্ষুধার সাথে মানুষের প্রতিনিয়ত যে সংগ্রাম তাকে আরও ত্বরান্বিত করতে হবে। বলা যায় মানুষের এই সংগ্রামকে আরও বেগবান করবার জন্য FAO 'র এই বিশেষ কার্যক্রম। উৎযাপনের শুরুর বছর থেকেই এই বিশেষ দিনটির জন্য একটি করে স্লোগান নির্দিষ্ট করা থাকে। এ্টা অনেকটা সময়ের আবেদনের উপর নির্ভর করে তৈরি করা হয়। এবছরের প্রতিপাদ্য ছিল "খাদ্য নিরাপত্তা বনাম জলবায়ু পরিবর্তন এবং জৈব জ্বালানি" । পৃথিবীব্যাপী এখন জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বেশ হৈচৈ হচ্ছে। । তবে খাদ্য সমস্যাও কম ঝড় তোলেনি। সারা পৃথিবীই খাদ্য সংকটে ভুগছে বলে মনে হয়। যার জন্য তর-তর করে খাবারের দাম বেড়ে আজ সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে গেছে প্রায়। অমর্ত্য সেনের ভাষায় এটাই দুর্ভিক্ষ। ২০০৫-০৬ এর মধ্যে FAO 'র মূল্য সূচক অনুসারে খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধি ছিল ১২ শতাংশ। ২০০৭ সালে তা দাঁড়ায় ২৪ শতাংশে। এবছর এই সূচক দাঁড়িয়েছে ৫০ শতাংশে। যদিও বিশ্বব্যপী এবার ফলন ভালো হয়েছে। তবুও FAO 'র মহাসচিব ড. জ্যাক দিউফ-এর আশংকা, কয়েক বছর ধরে খাবারের দাম চড়াই থাকবে। খাদ্যমূল্যের এই আকাশমুখী আচরণের প্রধান কারণ দানা শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির হার অত্যন্ত ধীর। International Food Policy Research Institute এর মহাপরিচালক জোয়াচিম ফন ব্রাউন-এর সাথে সুর মিলিয়ে এই মন্তব্য করেছেন প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ প্রফেসর ড. এম এ সাত্তার মন্ডল। বিশ্বখাদ্য দিবস ২০০৮ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত তাঁর এক প্রবন্ধে তিনি এ কথা বলেছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, ২০০১-০২ সালে বিশ্বব্যপী চালের উৎপাদন ছিল ৪০০ মিলিয়ন মে. টন। ২০০৭-০৮ সালে তা দাঁড়ায় ৪৩৫.২ মি.টনে। বৃদ্ধির হার মাত্র ১.৪ শতাংশ। গমের ব্যাপারে এই বৃদ্ধির হার আরও কম। মাত্র ০.৬৫ শতাংশ। খারাপ আবহাওয়া এর অন্যতম কারণ। যাহোক ২০০৮-০৯ এ এই পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হবে বলে আশা করা যায়। তবে উৎপাদনের হার শ্লথ হওয়ায় প্রধান প্রধান চাউল বা খাদ্য রফতানিকারক দেশগুলোর মধ্যে কিছুটা আতঙ্ক বিরাজ করছে বলে মনে হয়। কারণ তাদের সঞ্চিত খাদ্যের ভান্ডারে টান পড়ার সমূহ সম্ভাবনা। এই কারণেই ভারত আমাদের দেশে চাল বিক্রী করতে রাজী হয়নি বা চালের দাম বাড়িয়ে তার রফতানিকে নিরুৎসাহিত করতে চেয়েছে। একই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে কম্বোডিয়া, ভিয়েৎনাম, চীন এবং মিশর। এক সময় বিশ্ববাজারে চালের দাম উঠে যায় টন প্রতি ১১০০ ডলারে। আমাদেরও চালের মূল্য বাগে রাখতে গতানুগতিক দরে বাইরে থেকে কিছু চাল আমদানি করার দরকার ছিল তখন। ফিলিপিনেরও বোধ হয় একই অবস্থা চলছিল। কিন্তু গ্যাঁটে টাকা বেঁধেও এদুটো দেশ তাদের প্রয়োজনীয় চাল যোগাড় করতে পারেনি।

বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি খাদ্য সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলছে বলে কেউ কেউ মনে করছেন। জ্বালানি তেলের অগ্নিমূল্যের কারণে অনেক দেশই জোরো-শোরে জৈব জ্বালানির কথা ভাবছে। ফলে খাবারের উপযোগী ফসলকে জৈব জ্বালানিতে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। তা নাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশের অতিরিক্ত খাদ্যকে খাদ্যঘাটতির দেশ সমূহে চালান করে কিছুটা হলেও খাদ্য-সংকট লাঘব করা যেতো। ব্রাজিল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জৈব জ্বালানির এব্যাপারে যথেষ্ট এগিয়ে আছে। জৈব জ্বালানির প্রধান উৎস হলো সালোকসংশ্লেষণে সক্ষম গাছপালা। সাধারণত দুধরনের গাছপালা বা ফসল ব্যবহার করা হয়ে থাকে জ্বালানি তেলের জন্য। চিনি বা শর্করা সমৃদ্ধ ফসল, যেমন আখ, বিট, মিষ্টি সরগম, ভুট্টা। এগুলো থেকে ফার্মেনটেশনের মাধ্যমে ইথানল জাতীয় দাহ্য পদার্থ তৈরি করা হয়। আরেকটি হলো, তেল জাতীয় ফসল। যেমন ওয়েল পাম, সয়াবিন ইত্যাদি। এগুলোর তেল তাপ দিয়ে কিছুটা ঘন করে ডিজেল ইঞ্জিনে ব্যবহার উপযোগী করা হয়। সাধারণত জৈব জ্বালানিকে পরিবেশ-বান্ধব জ্বালানি হিসাবেও বিবেচনা করা হয়। মনে করা হয়, জৈব জ্বালানি পুড়বার সাথে সাথে, যে পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গত হয়, সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে গাছ সেই পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইডই বাতাস থেকে শুষে নেয় । সুতরাং কার্বন-ডাই-অক্সাইড-এর নীট পরিমাণের কোনো হের-ফের হয় না। কিন্তু পেট্রোল জাতীয় জ্বালানি বহুকাল ধরে মাটির নিচে ধরে রাখা কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে পুড়ে যাওয়ার সাথে সাথে বাতাসে ছেড়ে দিচ্ছে। অতএব বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড-এর পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। যাহোক বিশ্ব এখন জৈব জ্বালানির পক্ষেই কথা বলছে। বর্তমানে সারা পৃথিবীর জৈব জ্বালানি উৎপাদনের ক্ষমতা বছরে মোট ৩২.৬ মিলিয়ন টন। তৈরি করা হচ্ছে ১১.৬ মিলিয়ন টন। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ২০১০ সাল নাগাদ ৫.৭৫ শতাংশ এবং ২০২০ নাগাদ ১০ শতাংশ জৈব জ্বালানি ব্যবহারের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইচ্ছে হলো বছরে ৩৫ বিলিয়ন গ্যালন জৈব জ্বালানি ব্যবহার করা। তা যদি করতে হয় তবে সমগ্র শিল্পন্নোত দেশের কৃষি জমি এই কাজেই শেষ হয়ে যাবে। ইউরোপের ৭০ শতাংশ জমিতে জৈব তেলের ফসলের চাষ করতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত জমিতে সয়াবিন এবং ভুট্টার চাষ করতে হবে। ইতোমধ্যেই এই দেশ তার উৎপাদিত ভুট্টার ৯০ শতাংশ ইথানল উৎপাদনে ব্যয় করছে। কিন্তু এই সমস্ত শিল্পন্নোত দেশগুলো কী এরচেয়েও বেশি এগুতে চাইবে? সম্ভবত না। তারা তাদের চোখ ফিরাবে উন্নয়নশীল বিশ্বের দিকে।

বহুজাতিক কোম্পানিগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়বে তাদের পুজিপাট্টা নিয়ে। তৃতীয় বিশ্বের চাষীরা বেশি লাভের আশায় হয়তো জৈব জ্বালানি সমৃদ্ধ ফসল চাষের দিকে ঝুঁকে পড়বে। ফলে শুধু অনাহক খাদ্য পরিস্থিতিই নয় আরও অনেক দৈব-দুর্বিপাক ঘটতে পারে। কারণ জৈব-জ্বালানি নিয়ে ইতোমধ্যেই বেশ কিছু সমালোচনা শুরু হয়েছে। যেমন: জৈব জ্বালানির খাতিরে সাধারণ জীব বৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়তে পারে। প্রতিষ্ঠিত বনভূমি উজাড় হওয়ার সম্ভাবনা। ফলে কার্বন-সিঙ্ক কমে যাবে। তাই কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাড়বে না বলে যে যুক্তি, তা হয়তো ধোপে টিকছে না। এছাড়াও কোনো কোনো school of thoughts বলছে যে প্রতি টন পাম ওয়েলের জন্য ৩৩ টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গত হয়। সাধারণ পেট্রোলিয়াম থেকে এই পরিমাণ ১০ গুণ বেশি। গ্রীষ্মমন্ডলীয় বনভূমি উজাড় করে আখ চাষ করে যে জ্বালানি পাওয়া যাবে সেখান থেকে যে গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গত হবে তা সম পরিমাণ গ্যাসোলিনের ব্যবহার থেকে ৫০ শতাংশ বেশি । ব্রাজিলে : জৈব জ্বালানির প্রয়োজনে সয়াবিন চাষের জন্য জমি উদ্ধার করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই আদিবাসী এবং প্রান্তিক চাষিদেরকে বাস্তুচ্যুত করতে হবে। গোচারণ ভুমিও ক্ষতিগ্রস্থ হবে। সামগ্রীক ভাবে জৈব-জ্বালানি-নির্ভর ফসলের চাষ বাড়াতে গেলে মানুষ ও পশুর জন্য খাদ্য উৎপাদনের জমির টান পড়বে। খাদ্য উৎপাদন খরচ বেড়ে যাবে। সাধারণ ভোক্তারা তাদের ক্রয় ক্ষমতা হারাবে। গ্রীষ্মমন্ডলীয় বনভূমি কমে যাওয়ার কারণে জলবায়ুর উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে।

জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব সরাসরি খাদ্য নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সারা পৃথিবীতে যে অস্বস্তিকর পরিবর্তন আসতে পারে তা আগের অনেক লেখায় আমি তুলে ধরেছি। জলবায়ুর কারণে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও ধরনের পরিবর্তন হবে। পরিবর্তন হবে বন্যা, এবং খরার প্রকৃতির। বাংলাদেশের পরিবেশ উপর প্রকাশিত বিশেষ প্রতিবেদন বলছে ২০৫০ সাল নাগাদ সাগরের উচ্চতা বেড়ে যাওয়ায় তিন হাজার মিলিয়ন হেক্টর ফসলের জমি পানির নিচে চলে যাবে। ফলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ধান, গম, আখ, পাট, এরং রবিশস্যের উৎপাদন কমে যাবে। ব্যবহার উপযোগী পানির অভাব হবে। শুষ্ক বা অপেক্ষাকৃত কম শুষ্ক এলাকার জন্য প্রতি ডিগ্রী তাপমাত্রা বাড়ার কারণে সেচের চাহিদা বাড়বে ১০ শতাংশ। পরিবর্তিত জলবায়ু মৎস্য সম্পদের ক্ষতি করবে। কোরাল রীফ, উপকূল ও Mangrove ফরেষ্ট ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। দুর্গত পরিবেশের কারণে মানুষ, পশু ও ফসলাদীর অনিয়ন্ত্রীত আনাগোনায় পশু এবং ফসলাদীর রোগ-বালাই বেড়ে যাবে।

জলবায়ু যে পরিবতিত হচ্ছে তার বেশ কিছু আভাষ আমরা ইতোমধ্যে পেয়ে গেছি। গ্রীষ্মকালের প্রচন্ড তাপদাহ, শীতকালে শীতের প্রকোপ বৃদ্ধি, শীতও না গরমও না এমন সময়ে তাপমাত্রার অযাচিত আচরণ আমরা লক্ষ্য করছি। ফলে ফসলের যে স্বাভাবিক মওসুমের সাথে আমাদের পরিচয় তার বত্যয় ঘটছে। কিছু কিছু ফসল আগের মতো ফলন দিচ্ছে না। সাম্প্রতিক মডেল নির্ভর ফয বি এ আর সি'র ড. শেখ ঘুলাম হোসেনের গবেষণায় দেখা গেছে তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে ২০৫০ সাল নাগাদ আউশ ধানের ফলন কমে যাবে ১.৫-২৫.৮ শতাংশ। আমনের জন্য এই পরিমাণ ০.৪-৫.৩ শতাংশ। তবে বোরোর বেলায় কিছুটা উল্টো হিসাব দেখা গেছে যদি তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসের উপর না যায়। অর্থাৎ ফলন ১.২-৯.৫শতাংশ বাড়ার সম্ভাবনা। তাপমাত্রা কিছুটা বেড়ে যাওয়ায় গমের ফলনের উপর প্রভাব পড়েছে। এক হিসেবে তাপমাত্রা যদি ১ ডিগ্রী বাড়ে তবে বাংলাদেশে চলতি জাতের গমের উৎপাদন-ক্ষমতা আশঙ্কজনকভাবে কমে যাবে। আমাদের দেশে গমের আবাদি আওতা ১৯৯৮-৯৯ সালের সর্বোচ্চ ৮.৮২ লাখ হেক্টর থেকে কমে ২০০৭-০৮ সালে ৩.৭০ লাখ হেক্টরে দাঁড়িয়েছে। ছোলা, মসুর বা মুগডালের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। অপরদিকে অধিকতর তাপ সইতে পারে এমন ফসল যেমন ভুট্টার আবাদি আওতা একই সময়ে ০.১৮ লাখ হেক্টর থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩.৮২ লাখ হেক্টরে এসে দাঁড়িয়েছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বাষ্পীভবন প্রক্রিয়া বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে খরার প্রকোপ বাড়ছে। সামুদ্রিক ঝড়, টর্নেডো, গরম হলকা বাতাস, শিলাবৃষ্টির আনাগোনা আগের চেয়ে বেশি। শিলা বৃষ্টি, অকাল বন্যা, পাহাড়ি ঢল এখন হর-হামেশাই হচ্ছে। হাওর এলাকায় পানি সময়ের আগেই চলে যাওয়ায় বাধ্যতামূলকভাবে আগাম আবাদ করা বোরোধান তার প্রজনন পর্যায়ে নিচু তাপমাত্রার শিকার হচ্ছে। আবার দেরি করে লাগানো বোরোধান তার পাকা পর্যায়ে পাহাড়ি ঢলের শিকার হচ্ছে। দিনের আালোক প্রাপ্যতাও কমে যাওয়ার রিপোর্ট আছে। বিষয়টি দিবালোক নির্ভর ধান বা পাটের জন্য ব্যাপরাটা মোটেই সুখকর না।

এই জলবায়ু পরিবর্তনের ধাক্কা এবং জৈব-জালানি সংক্রান্ত জটিলতা থেকে আমাদের বাঁচার উপায় কী? বিশ্ব ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিকতম খবর হলো তাবদ্ বিশ্বের অর্থব্যবস্থাপনা এখন বড়ই নড়বড়ে অবস্থায়। আর গরীব মানুষেরা তাদের বেঁচে থাকার শেষ সীমায় অবস্থান করছে। বিশ্বব্যাঙ্কের শেষ খবর অনুযায়ী এ বছর অপুষ্টিতে ভোগা মানুষের সংখ্যা দাঁড়াবে ১০০

কোটি। চ্যারিটি কেয়ার ইন্টারন্যাশনালের মতে এর মধ্যে ২২ কোটি মানুষ অনাহারের দ্বারপ্রান্তে। গতবছরের তুলনায় এই সংখ্যা দ্বিগুণ। আফগানিস্তান থেকে জিম্বাবুয়ে, সব জায়গায়ই খাবারের তীব্র সংকট। এর জন্য শুধু যে অজন্মা বা আনুষঙ্গিক কারণ সমূহ দায়ী তা নয়। বিশ্বব্যপী দাতা দেশ বা সংস্থা সমূহ অনেকটা দাযী। অনেক সময় তারা তাদের কমিটমেন্ট রাখে না। বা তাদের ত্রাণ তৎপরতা ত্রুটিযুক্ত। অনেক দেশ নিজেদের ব্যাপারে বেশি সচেতন হয়ে পড়ায় ভূক্তভোগী দেশের বেলায় কোনো প্রকার মানবীয় আচরণ দেখাতে ব্যর্থ হয়। বিশ্বব্যাপী এই দুরবস্থার শিকার কম বেশী সবাই। তবে অমানবিক দুর্ভোগের শিকার গরীবরাই বেশি। বিশেষ করে যারা জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকির মুখে বাস করছে। এক জরিপে বলা হয়েছে, স্কটিশরা তাদের আয়ের মাত্র ৯ শতাংশ খাবারের জন্য ব্যয় করে। আর কেনিয়ানরা ৮০ শতাংশ। স্কটিশদের খাবারের দাম বেড়েছে ৮.৩ শতাংশ। আর ইথিওপিয়ানদের ৩০০ শতাংশ। আমাদের বেলায় আমরা নিজেরাই তার সাক্ষী। এযেন মরার উপর খাঁড়ার ঘায়ের থেকেও বেশি।

জলবায়ু পরিবর্তন সাপেক্ষে খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে সারা বিশ্বই কিছু না কিছু ভাবছে। বাংলাদেশ সরকার এর ব্যতীক্রম না। এব্যাপারে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী the National Food policy Plan of Action (2008-2015) এবং Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan, 2008 এই দুটো দলিলে বিশদ বর্ণনা করা আছে। যে কোনো অবস্থায় খাদ্য নিরাপত্তার অর্থ হলো সবার জন্য পুষ্টি, স্বাস্থ্য এবং উন্নততর জীবন যাত্রার নিশ্চয়তা বিধান করা। এজন্য যত পরিকল্পনাই করা হোক না কেন সবার আগে যা যা জরুরী তাহলো-

১. প্রতিকুল পরিবেশে অভিযোজনক্ষম শস্যের জাত ও উৎপাদন কলাকৌশল উদ্ভাবনের জন্য আধুনিক গবেষণার পরিবেশ তৈরি করা। কারণ চাষীর হাতে সঠিক জাত এবং প্রয়োজনীয় কলাকৌশল তুলে না দিতে পারলে তার পরিশ্রম বৃথা যাবে।
২. ফসল (সবজি/ফল)-পশু-মৎস্য সমন্বয়ে Integrated Microfarming approach তৈরি করা। সত্যি কথা বলতে বাস্তবে এমনকোনো প্রচেষ্টা আছে বলে আমার জানা নেই। যেহেতু আমাদের অধিকাংশ চাষীরাই ছোট ছোট খামারি বা প্রান্তিক চাষী। তারা যাতে এক জোড়া গরু, গুটিকয় ছাগল, কিছু হাঁসমুরগী, একটা মিনি পুকুর, উঠোনোর পাশে বারোমাসি সবজির বাগান, সামান্য মাশরুম আবাদের সুযোগ সুবিধা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে, এমন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা।
৩. এই উদ্দেশ্যে বিশেষ ঋণকার্যক্রম চালুকরে যাবতীয় ইনপুট সহজলভ্য করা, শস্যবীমা চালু করা। ফলে কোনো চাষি নিশ্চিন্তমনে তার উৎপাদন কার্যক্রমকে সহজাতভাবে এগিয়ে নিতে পারবে।

এবারের বিশ্বখাদ্য দিবসে প্রধান উপদেষ্টা মহোদয় বছরের প্রতিপাদ্য বিষয়কে উপলক্ষ্যে করে প্রণোদোনামূলক বক্তব্য রেখেছেন। তিনি কৃষি গবেষক এবং কৃষকদেরকে তাদের উদ্ভাবনী শক্তি কাজে লাগানোর অনুরোধ করেছেন। তিনি বছরে একটি দিন জাতীয় কৃষি দিবস হিসেবে পালনের ঘোষনা দিয়েছেন এবং একটি জাতীয় কৃষি জাদুঘর স্থাপনের কথা বলেছেন। সরকার প্রধান হিসেবে তাঁর এই বক্তব্য শুধু জাতীয় নয় আন্তর্জাতিক পর্যায়েও বিশেষ গুরুত্ব পাবে আশা করি। বিশ্ব খাদ্য দিবস পালনের প্রথম বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল ”সবার আগে খাদ্য” । প্রকৃত পক্ষে এই প্রতিপাদ্য কোনো নির্দিষ্ট বছরের জন্য নয়, চিরকালের।